বিশুদ্ধবাণী

চতুর্থ ভাগ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
সম্পাদিত

To be returned by date mentioned below, otherwise a fine of 10 Paise will have to be paid per day

23.7.74

Presented to Ma Anandamayi Ashram, Varanasi 4.9.70 Gopinath Kaviraj

বিশুদ্ধবাণী

চতুর্থ ভাগ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্
সম্পাদিত

'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম
মালদহিয়া, ৺কাশীধাম
সন ১৩৬২ সাল

[মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
(২৪ পরগণা)

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
বিশুদ্ধানন্দ কানন, মালদহিয়া, বেনারস।
অথবা
২ এ, সিগরা, বেনারস।

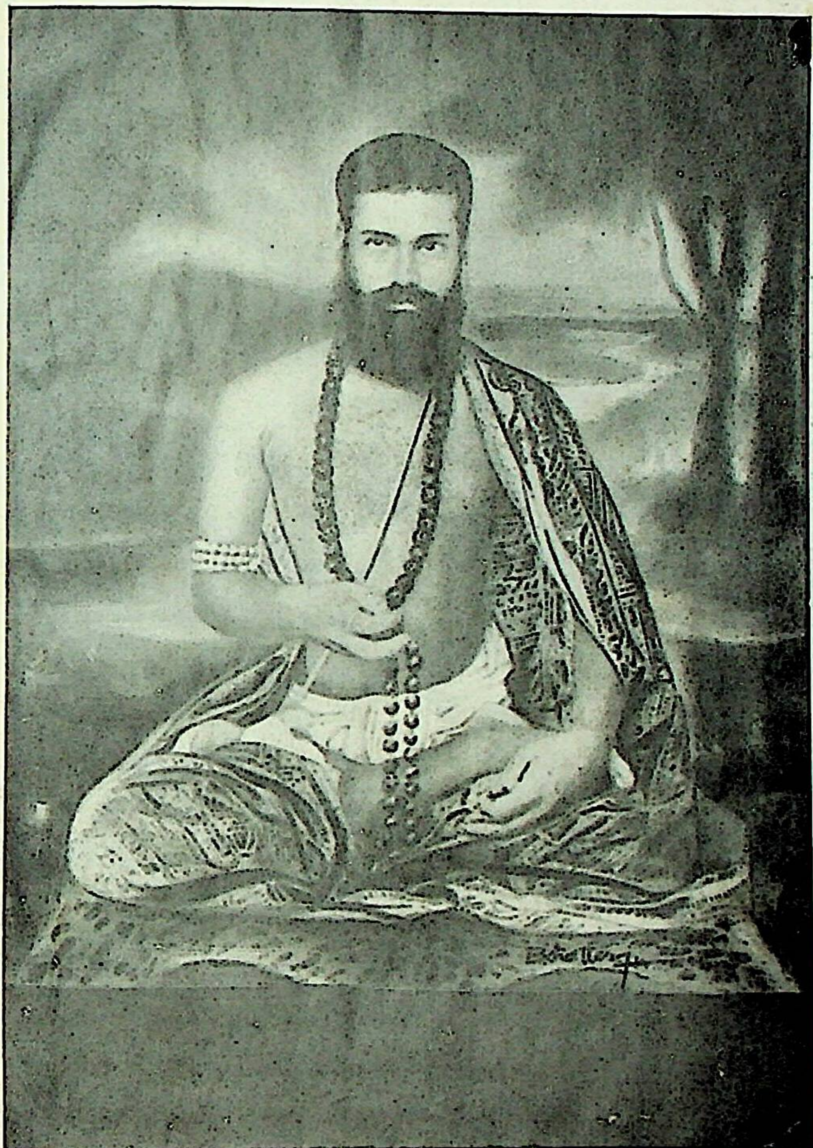
২। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী,
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

৩। শ্রীফণিভূষণ চৌধুরী,
৭৭ (বি), কালী টেম্পল রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা—২৬।

৪। মহেশ লাইব্রেরী,
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২।

মুদ্রক—শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কমলা প্রেস,
বেনারস।

—সূচী পত্র—



শ্রীশ্রীযোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব
(যৌবনাবস্থা)

বিশুদ্ধবাণী

চতুর্থ ভাগ

আশা

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

বিনাঽপি ভক্তিং প্রণতিং করোমি
জপামি মন্ত্রং মননং বিনৈব।
স্তবং বিনা ভাবলবং তনোমি
প্রকল্পয়ে ধ্যানম্ অযুক্তচিত্তঃ ॥ ১ ॥

মনে ভক্তির আবেশ না হইলেও প্রণাম করি, মনন বিনাই মন্ত্র জপ করি। লেশমাত্র ভাব না থাকিলেও স্তবস্তুতি বিস্তার করি এবং চিত্ত যুক্ত না হইলেও ধ্যানে প্রবৃত্ত হই।

অদভ্র-দুর্ভাগ্য বশাৎ প্রবৃত্তো
বিড়ম্বনামাত্রফলোত্থমোহয়ম্।
ত্বয়ৈব সোঢ়ব্য ইহাঽক্ষমস্য
শিশোরচেষ্টেব তদম্বয়াঽম্ব ॥ ২ ॥

জন্মান্তরীণ অত্যধিক দুষ্কর্ম্মবশে প্রবৃত্ত এই যে (বৈগুণ্যযুক্ত) উত্থম, যাহার ফল বিড়ম্বনা ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, তাহা হে মা, অক্ষম শিশুর অল্প বা অপ্রশস্ত (বৈগুণ্যদুষ্ট) চেষ্টা যেমন তাহার জননী মানিয়া লয়েন, সেইরূপ তোমাকে মানিয়া লইতে হইবে।

অনাতরং মাম্ অনপেক্ষ্য পণ্যং
ন তারয়েৎ কোঽপি গতিস্ত্বমেকা।
অনন্যসাধ্যেন গদেন দূনঃ
শিবে প্রপন্নোঽস্মি ন বঞ্চনীয়ঃ ॥ ৩ ॥

আমার "পারের কড়ি" নাই, কড়ি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে পার করিবে না ; একা তুমিই আমার গতি। অন্যের অসাধ্য রোগে পীড়িত আমি তোমাতে প্রপন্ন ; হে শিবে, আমাকে বঞ্চিত করিও না।

স্বভাবতোঽহং প্রবণোঽপরাধে
স্বভাবতস্ত্বঞ্চ বহুক্ষমাঽসি।
নাহং ক্ষমো হাতুম্ অমুং স্বভাবং
ত্বং সুস্থিতং কিং পরিহাস্যসি ত্বম্ ॥ ৪॥

আমি স্বভাবতঃ অপরাধপ্রবণ (অপরাধ করাই আমার স্বভাব), আর তুমিও স্বভাবতঃ বহুক্ষমা (ক্ষমাই তোমার স্বভাব)। আমি আমার স্বভাব ছাড়িতে পারি না, তুমি কি তোমার সুস্থিত স্বভাব ত্যাগ করিবে ?

লীলাঽঽবিলা স্যাদ্ অমলে তথা তে
লগ্না ভবেন্নাম্নি কলঙ্কলেখা।
পঙ্কেন লিপ্তস্তনয়ো নু হেয়ঃ ?
প্রক্ষাল্য যত্নেন হি লালনীয়ঃ ॥ ৫ ॥

(হে মা,) তুমি অমলা, উহাতে তোমার লীলা মলিন হইয়া যাইবে, এবং তোমার নামে কলঙ্কলেখা লগ্ন হইবে। পুত্র পঙ্কে

লিপ্ত হইলে সে কি বর্জ্জনীয় হয় ? তাহাকে প্রক্ষালিত করিয়াই লালন করিতে হয়।

আশা মমৈষা স্বয়মেব যৎ ত্বং
পীযূষবর্ষেণ পদে স্থিতং তে।
ভরিষ্যসীদং পরিশুষ্ক-ভাণ্ডং
বিচারপূর্ব্বা ন কৃপাপ্রবৃত্তিঃ ॥ ৬ ॥

আমার আশা এই যে, তুমি নিজ হইতে অমৃতবর্ষণ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে স্থিত এই নিতান্ত শুষ্ক ভাণ্ডটাকে ভরিয়া দিবে। (কেন না) কৃপা ত অগ্রে যোগ্যতার বিচার করিয়া প্রবৃত্ত হয় না।

জ্ঞানগঞ্জ

(৩)

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের গুরুধাম বা তাহার অংশবিশেষ (কেন না জ্ঞানগঞ্জ, মনোহর তীর্থ ইত্যাদি লইয়া একটি ধামই মনে করা সঙ্গত) জ্ঞানগঞ্জের স্থূল পরিচয় যতটুকু জানি এবং তাহারই আলোকে আরও যতটুকু অনুমান করিতে পারি এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব দুই খণ্ডে তাহা বলিয়াছি। স্থূলের পশ্চাতে একটা সূক্ষ্ম দশাও যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; দেশকালে ব্যাপ্ত সকল পদার্থেরই স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপই আছে। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের সূক্ষ্ম পরিচয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন সৃষ্টি কর্ত্তার মূল অভিপ্রায়ের বিষয় বিবেচনা করিলে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও ব্রহ্মাণ্ড ও ভাণ্ডের মৌলিক ঐক্য বা সাদৃশ্য সম্বন্ধে যাহা শুনা যায় তাহা হইতে সকল পদার্থেরই এক একটা আধ্যাত্মিক রূপও আছে ইহা মনে করা যায়। স্থূল রূপকে যদি ইংরাজীতে material aspect বলা যায়, তাহা হইলে সূক্ষ্মরূপকে (থিয়োসফির পরিভাষায়) astral এবং আধ্যাত্মিক রূপকে spiritual aspect বলিলে বিভেদ রক্ষিত হয়। কাশী ও কুরুক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক পরিচয় সম্বন্ধে আভাসে কিঞ্চিৎ উল্লেখ

এই প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে করিয়াছি। জ্ঞানগঞ্জের আধ্যাত্মিক পরিচয় আমাদের মধ্যে বোধ করি এক শ্রীযুক্ত গোপীনাথই দিতে পারিবেন। অন্ততঃ উহা আমার অধিকারের বাহিরে।

জ্ঞানগঞ্জের সূক্ষ্মরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানা গিয়াছে এবং তদনুসারে যতটুকু অনুমানও করা যায় তাহাই এস্থলে নিবেদন করিতে চাই।

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ইদানীং স্থূল দেহ মুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পত্নীবিয়োগের পরে একদা তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করেন, তিনি (অর্থাৎ তাঁহার পত্নী) তখন কোথায় কি ভাবে আছেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলেন, "সে এখন তোমাদের মাতার (অর্থাৎ গুরুদেবের পত্নী পরলোকগতা পূজনীয়া কৃষ্ণভামিনী দেবীর) সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জে আছে।" ঐরূপে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের মাতৃ-বিয়োগের পর বাবা বলিয়াছিলেন তিনিও জ্ঞানগঞ্জে আছেন।

এই যে জ্ঞানগঞ্জ ইহা অবশ্যই রেলপথে জলন্ধর পর্য্যন্ত গিয়া তৎপর গোগা হইয়া হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক গন্তব্য জ্ঞানগঞ্জ হইতে পারে না। এ জ্ঞানগঞ্জে যাইতে হইলে মৃত্যুর দ্বার দিয়া যাত্রা করিতে হয় এবং বৈতরণী পার হইয়া যাইতে হয়। বৈতরণী বলিতেছি এইজন্য যে, শাস্ত্রমতে উহা নাকি সকলকেই পার হইতে হয়। স্পিরিচুয়ালিষ্ট (আত্মিক গবেষণায় রত ব্যক্তি) গণও পরলোকগত কোনও কোনও আত্মার উক্তির প্রামাণ্য বলিয়া থাকেন। স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে আত্মাকে একটা অন্ধতমসাচ্ছন্ন ক্লান্তিকর দেশভাগের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। তাহারা কেহ কেহ উহাকেই বৈতরণী বলিয়াছেন।

আমরা শাস্ত্রের প্রামাণ্যে উহাকে নদীই বলি; তবে বাবার শিষ্যগণকে বোধ করি উহা গো-লাঙ্গুল ধরিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয় না। গুরু-কৃপাই সুগম সেতু গড়িয়া দেয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা যায় যে, জ্ঞানগঞ্জ যাত্রার দিন ক্ষণও কালের শক্তি বা কোষ্ঠীর গ্রহ-সংস্থান দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীশ্রীবাবার ইচ্ছাই উহার নিয়ামক। পূর্ব্বোক্ত কুঞ্জদাদার মুখেই শুনিয়াছি তাঁহার কোষ্ঠীতে মাত্র ৪১ বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট ছিল, গণক উহার অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে এরূপ নিঃসন্দেহ ছিল যে, উহার পরের দশাভেদ আর গণনাই করে নাই। বাবা হইতে দীক্ষালাভের পর কুঞ্জদাদা যথেষ্ট নিষ্ঠা ও উৎসাহ-সহকারে ক্রিয়া করিতে থাকেন। তাঁহার বয়স ৪১ বর্ষের কাছাকাছি পৌঁছিলে একদিন বাবা নিজ হইতেই বলেন, "কুঞ্জ, সেখান (অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ) হইতে তোমার পরমায়ু আপাততঃ কুড়ি বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইল।" (বাবা সকল কথাতেই জ্ঞানগঞ্জের ওজর দিতেন, নিজের হাত কিছু আছে তাহা বলিতে চাহিতেন না। আর দেখাও যায় জ্যেঠা গুরুদেব শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস একাধিক পত্রে বাবাকে বলিতেছেন, তুমি তোমার শিষ্যগণ সম্বন্ধে কিছু দেখিবে না, আমিই দেখি।) দেখা গিয়াছে কুঞ্জদাদা যখন দেহ রাখেন তখন তাঁহার বয়স ৬১ বৎসরের কম নিশ্চয়ই ছিল না, অল্প কিছু বেশী হওয়াও সম্ভব। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে আয়ুর তদনুরূপ পরিবর্দ্ধন "সেখান হইতেই" করা হইয়াছিল মনে করিতে হইবে। বাবার আরও এক শিষ্যের কথা জানি ভৃগু-কোষ্ঠীতে তাহার বয়স নির্দ্ধারিত ছিল ৬৮ বৎসর। যখন তাহা

উত্তীর্ণ হইল তখন এক অভিজ্ঞ জ্যোতিষী তাহার ঠিকুজী দেখিয়া বলেন, "৬৮ নয়, আপনার পরমায়ুর পরিমাণ ৭২ বৎসর।" বর্ত্তমানে তাহার পরমায়ু ঐ সীমাও লঙ্ঘন করিয়াছে। এখানে কোষ্ঠীর বল ক্ষুণ্ণ এবং কালের শক্তি প্রতিহত। শ্রীশ্রীবাবার শিষ্যদের উপর (সম্ভবতঃ সকল সদ্‌গুরুর শিষ্যদের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে) যে যমের অধিকার নাই তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একটি গুরু-ভগিনীর কলেরা রোগে "মৃত্যু" বা তত্তুল্য অবস্থার এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির যে বিবরণ "বিশুদ্ধবাণী" দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় এই সকল ব্যাপার সূক্ষ্মলোকেই হইয়া যায়। সূক্ষ্মেই গুরুশক্তি রক্ষা করেন, আবার গুরুর নিজ বিচার মতে সময় হইলে সেই শক্তিই নিয়াও যান।

এ ত গেল অবান্তর কথা। প্রবন্ধের মূল বিষয় সম্পর্কে একটা প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে উঠা সম্ভব। সেটি হইতেছে এইরূপ : শুনা গিয়াছে—শ্রীশ্রীবাবাই বলিয়াছেন—তাঁহার শিষ্যদের পারলৌকিক ব্যবস্থারূপে অমিত ঐশ্বর্য্যশালী জেঠা গুরুদেব শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস একটি ধাম নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন ; মৃত্যুর পর সকলে সেই ধামে যাইবে এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া অপূর্ণ কর্ম্ম পূর্ণ করিবে। তাহাদিগকে আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। সে ধামের কোনও নাম বাবা প্রকাশ করেন নাই, আমরাও জিজ্ঞাসা করি নাই। অন্যদিকে আবার বলা হইয়াছে কুঞ্জদিদি ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথের জননী জ্ঞানগঞ্জে আছেন। এই দুই উক্তি পরস্পর বিরোধী নয়

কি ? তাহা অবশ্য হইতেই পারে না। এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে ভার্গবী (অর্থাৎ ভৃগুরাম প্রণীতা) পুরী সূক্ষ্ম জ্ঞানগঞ্জেরই অংশবিশেষ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে—গুরুদেবের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ অধিক মাত্রায় কর্ম্মী, কেহ অল্প মাত্রায়ই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সকলের মনও সমান শুদ্ধ নয়, রুচি, আচার-আচরণেও প্রভেদ সুপ্রচুর। সকলেই যদি মৃত্যুর পর একই ধামে স্থান পায়, তাহা হইলে মুড়ি মিছরি যে তুল্য মূল্য হইয়া গেল। ইহার উত্তর বাবার মুখেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি এ বিষয়ে জানকী (বন্দ্যো) দাদাকে বলিয়াছিলেন, এই যেমন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া লোকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসে, সেইরূপ সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। এই প্রসঙ্গে পুনরায় কুঞ্জদাদার কথা বলিতে হইতেছে। কুঞ্জদাদার তিরোধানের পর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কুঞ্জদাদার কেমন গতি হইল ?

বাবা। কুঞ্জকে কিছুদিন একটু নিম্নস্তরে থাকিতে হইবে।

গোপীনাথ। কেন ? তিনি ত খুব কর্ম্মী ছিলেন।

বাবা। কুঞ্জর মনে আমার উপর একটা অবিশ্বাস ছিল।

গোপীনাথ। কত দিন নিম্নস্তরে থাকিতে হইবে ?

বাবা। বেশী দিন নয়, ধর এই নয় মাসের মতন।

উক্ত আলাপের কিছুদিন পরে একদিন বাবা নিজ হইতেই গোপীনাথকে বলেন, আজ কুঞ্জ উঠিয়া গেল গো।

এই সূক্ষ্ম জ্ঞানগঞ্জের মধ্যে জ্ঞানের রাজ্য, গুরুর রাজ্য ইত্যাদি রূপ বিভাগের কথা একজনের মুখে শুনিয়াছি। তাহা ঠিক

আপ্ত বাক্যরূপে গ্রহণ করা যায় না বলিয়া সে বিষয়ে কিছু বলিব না।

ভার্গবীপুরী ভোগধাম নয়। স্বর্গাদি লোক ভোগধাম। ইহলোকে যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করা হয় তাহাদের সুফল স্বরূপ নানা সুখ সেখানে ভোগ্য হয়। পার্থিব সুখ হইতে স্বর্গীয় সুখের বিশেষত্ব এই যে উহা দুঃখ-মিশ্রিত নয়, ভোগের অন্তে অবসাদ আনয়ন করে না; অভিলাষের উদয় মাত্রই তৎতৎ সুখের সকল উপকরণ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। কিন্তু যে যে পুণ্যের ফলে ঐরূপ অলৌকিক-সুখ লভ্য হয়, ভোগ দ্বারা সে সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া পুনরায় এই দুঃখবহুল ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" সূক্ষ্ম জ্ঞানগঞ্জ বা ভার্গবীপুরী হইতে সেরূপ চ্যুতির কোনও সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য স্বর্গ লাভ অপেক্ষা জ্ঞানগঞ্জ গমনের অধিকার লাভ শ্লাঘ্যতর। শ্রীশ্রীবাবা হইতে তাঁহার মহীয়সী কৃপার চিহ্ন মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকলেই অযাচিত সেই অধিকার লাভ করিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভার্গবীপুরী হইতেছে কর্ম্মধাম। মঙ্গলময় শ্রীগুরু এখানে আমাদিগকে মন্ত্র দান করিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত ক্রিয়াযোগ দিয়াছেন। তদনুসারে সাধন করিলে উচ্চতম গতি অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স অনিবার্য্য। কিন্তু আমাদের অনেকেরই এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা উপযুক্তরূপে মন্ত্র সাধন করিতে পারিতেছি না। কর্ম্ম করিবার জন্য কাহারও কাহারও আয়ুও শ্রীগুরু বাড়াইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, সে অনুগ্রহের মর্য্যাদাও সম্যক্ রক্ষিত

হয় নাই বা হইতেছে না। সেইজন্য শ্রীগুরুই তাঁহার নিজের বিচার মতে শিষ্য-শিষ্যাদিগকে উপযুক্ত কালে এখান হইতে লইয়া গিয়া ভার্গবীপুরীর যথাধিকার স্তরে সাংসারিক বাধা বিঘ্ন হইতে নির্মুক্ত ভাবে কর্ম্মে বসাইয়া দিতেছেন এবং দিবেন। ইহাই ঐ পুরী নির্ম্মাণের সার্থকতা। পুনর্জন্ম হইলে আবার কতকগুলি অপকর্ম্ম সঞ্চিত হইত। সে আশঙ্কা যে নাই ইহাই একটা পরম লাভ।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথের জননী সুখদা দেবী বাবার মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন না, বাবা হইতে মন্ত্র গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে আমি আমার বাল্যাবধি বিশেষ প্রকারেই জানিতাম। তিনি অতি সরল-চিত্তা ও মধুর-স্বভাবা মহিলা ছিলেন; কুলগুরু হইতে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার সদ্‌গতি অনিবার্য্য ছিল। অন্য উচ্চ ধামে গেলে, অবশ্যই কালে তাঁহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইত। জ্ঞানগঞ্জে স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় সে আশঙ্কা রহিত হইয়াছে। এই শ্লাঘ্যতরা গতি অবশ্যই তাঁহার তনয়ের গুরু-ভাগ্যের ফল বলিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণকারীর ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন কয়েক পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। সদ্‌গুরুর কৃপাও মহাফলা। তাঁহার কৃপাবৃষ্টি ছিটা ফোঁটায় শেষ হয় না; শিষ্যদিগের সহিত রক্তের ও প্রণয়ের বন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও অভিষিক্ত করে। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাহাদের স্ত্রী বা পুত্রকন্যা বা মাতাপিতার শ্রীশ্রীবাবা হইতে দীক্ষা লাভ ঘটে নাই (শিষ্যাদিগের ক্ষেত্রে অদীক্ষিত স্বামীও এই সঙ্গে বিবেচ্য) তাহাদের তদ্রূপ স্ত্রী পুত্রাদিও বাবারই কৃপায় জ্ঞানগঞ্জে স্থান প্রাপ্ত হইবেন বা ইতিমধ্যেই হইয়াছেন?

শ্রীশ্রীগুরুস্মৃতি

শ্রীগৌরীচরণ রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১)

সন ১৩২৬ সালের (খৃঃ ১৯১৯) ১লা বৈশাখ ৮পুরীতে "বিশুদ্ধানন্দ ধাম" নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় । বর্ত্তমানে আশ্রমের দৃশ্য যে আকারে দেখিতে পাওয়া যায় তৎকালে তাহার কিছুই ছিল না। ত্রিতল গৃহটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে নির্ম্মিত হয়। আর্ম্মষ্ট্রং রোডের দিকে মুখ করিয়া সাহেবী বাংলার কায়দায় একটি একতালা বাড়ী মাত্র ছিল। তাহাতে মাঝে দুইটি বড় ঘর ও তাহার উভয় পার্শ্বে ছোট আকারের বাথ রুম এবং ড্রেস রুম ছিল। বাবা দক্ষিণ দিকের ঘরটি ব্যবহার করিতেন ; উত্তর দিকের ঘরটি শিষ্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। উত্তর দিকে একটি রান্নাঘর ও তাহার একটু দূরে একজোড়া পায়খানা ব্যতীত আর কোন ঘরই ছিল না।

চারিদিকে কোন প্রকার প্রাচীর ছিল না, সীমানা নির্দ্দেশের জন্য স্থানে স্থানে কাঁটাসীজের বেড়া দেওয়া ছিল। তখন ফল বা ফুলের গাছ কিছুই ছিল না, কেবল বালুকারাশি ধূ ধূ করিত। রৌদ্রের সময় বালুকারাশি এত উত্তপ্ত হইত যে খালি পায়ে ঘরের বাহির হওয়া যাইত না। একটু জোরে হাওয়া বহিলে ঘরের মধ্যে বালি ঢুকিত। এ অবস্থা কিন্তু বেশী দিন থাকে নাই।

সে সময়ে উড়িষ্যায় বাবার কোন শিষ্য ছিল না, কেবল ৺অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী দাদা চাকরী উপলক্ষে (তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন) এখানে বাস করিতেন এবং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন গুরু-ভ্রাতাও এখানে ছিলেন। তিনি স্বল্প বেতনের কোন সরকারী চাকরী করিতেন। এই দুইজন ব্যতীত অন্য কোন গুরু-ভ্রাতা সেই সময় পুরীতে ছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। বাবা এবার পুরীতে কিছু দীর্ঘকাল বাস করায় তাঁহার মহিমার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং একে একে উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী ও উড়িয়া আসিয়া বাবার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় গুরু-ভ্রাতাদের পরিশ্রম এবং শিষ্য-মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় দুই তিন বৎসরের মধ্যে আশ্রমটি ফুলের বাগানে পরিবেষ্টিত হইল এবং ক্রমে ক্রমে আম প্রভৃতি ফলের গাছও রোপিত হইতে লাগিল।

এই বাগান প্রস্তুত করিতে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বড় কম হয় নাই। প্রথমতঃ কাঁটাগাছগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ইটের প্রাচীর দিয়া ঘেরা করা হইল। বালির উপর বাগান হয় না, সেই জন্য বহু দূর হইতে গো-গাড়ী করিয়া মাটি আনিয়া বালির উপর বিছাইয়া দেওয়া হইল এবং সার মিশাইয়া উর্ব্বরা করা হইতে লাগিল। দুই দিকের বড় রাস্তা পর্য্যন্ত খোয়া বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত হইল। বাগানের মাঝে মাঝে অপ্রশস্ত রাস্তা করিয়া তাহার মাঝে কেয়ারী করিয়া গাছ লাগান হইতে লাগিল। দুই জন মালী স্থায়ীভাবে কাজ করিত এবং আবশ্যক মত দুই চারিজন মজুরও লাগান হইত। এইভাবে দুই বৎসরে বাগান প্রস্তুত হইল।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বৎসরে রথযাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বেই পুরী গিয়াছিলাম। একদিন সকালবেলায় সম্মুখের বারাণ্ডায় অনেক লোক বাবার নিকট বসিয়াছিলেন, আমি একটু দূরে অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলাম। এমন সময় কে একজন বাবার হাতে একটি ফুল দিয়া বলিলেন—"বাবা, নূতন গাছে একটি কাঞ্চন ফুল ফুটিয়াছে দেখুন।" আমি কাঞ্চন ফুলের নাম শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাবার কাছে আসিলাম।

আমার জন্মভূমি নুনীগ্রামে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটি অতি প্রাচীন কাঞ্চন ফুলের গাছ ছিল। ফুলগুলি ছিল গাঢ় গোলাপী রঙ্গের ; ফুলগুলির একটি মনোহর সুগন্ধ ছিল। এই গন্ধ আমাকে খুব ভাল লাগিত ; সেইজন্য আমি খুব ভোরে উঠিয়া সকলের আগে ইহার ফুল পাড়িয়া আনিয়া ঠাকুর পূজার জন্য দিতাম এবং প্রসাদী ফুলগুলি নিজের কাছে রাখিতাম। গাছটি গুঁড়ি পোকায় জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছিল, আমার বার তের বৎসর বয়সের সময় গাছটি ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। তদবধি কোন বাগানে বা কোন গ্রামে আর কাঞ্চন ফুল দেখি নাই।

অনেক হাত ফিরিয়া ফুলটি যখন আমার হাতে আসিল তখন আমার আনন্দ অপেক্ষা নিরানন্দই বেশী হইল। ফুলের আকার আমার পূর্ব্বদৃষ্ট ফুলের মত হইলেও রং মিলিল না ; এই ফুলটির রং সাদা! সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই, ফুলটির কোন গন্ধই নাই। আমি সন্দিগ্ধভাবে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাবা, এটি কি কাঞ্চন ফুল?" বাবা বলিলেন—"হাঁগো, কেন

বল দেখি ?" আমি তখন বাবাকে হুনীগ্রামের সুগন্ধি কাঞ্চন ফুলের কথা বলিলাম। বাবা আমার সমস্ত কথা শুনিয়া আমার হাত হইতে ফুলটি লইয়া স্পর্শ করিলেন মাত্র, "এইবার দেখ দেখি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ফেরত দিলেন। কি আশ্চর্য্য ! ফুলটি হাতে লইবা মাত্র আমার পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের সুগন্ধের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কাঞ্চন ফুলের অপূর্ব্ব গন্ধে স্থানটি ভরিয়া গেল ; আমি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার দীক্ষার পর হইতে লেন্সের সাহায্যে, হস্তের দ্বারা, এমন কি নখের দ্বারা, ফোকাস করিয়া বাবাকে কত প্রকার গন্ধ আনয়ন করিতে দেখিয়াছি, বাবার শ্রী-অঙ্গ হইতে কত ভিন্ন প্রকার গন্ধ পাইয়াছি ; কিন্তু এমন আনন্দ লাভ কখনও করি নাই।

ফুলটি আমার হাত হইতে লইয়া সকলেই দেখিতে লাগিলেন। হাতে-হাতে ঘুরিয়া ফুলটি যে কাহার নিকট রহিয়া গেল, আমি বহু অনুসন্ধানেও তাহা বাহির করিতে পারিলাম না। সেই গাছ হইতে আরও অনেক কাঞ্চন ফুল ফুটিতে লাগিল, কিন্তু সেগুলি গন্ধ হীন। বাবা কেবল সেই ফুলটিতেই গন্ধ আনিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আমি আবু পাহাড়ে গিয়া ঐরূপ সদগন্ধ যুক্ত গাঢ় গোলাপী রঙ্গের অনেকগুলি কাঞ্চন ফুলের গাছ দেখিয়াছিলাম। আমি আমার বাগানেও কাঞ্চন ফুলের গাছ করিয়াছিলাম, তাহার রঙ্গ ও গন্ধ ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসর ফুল হওয়ার পর ফুল ফোটা বন্ধ হইয়া গেল। দশ পনর বৎসরে গাছ খুব বড় হইয়া উঠিল, কিন্তু পোকা লাগিয়া গাছটি মরিয়া গেল।

(২)

১৩২৫ সালে (খৃঃ ১৯১৮) কাশীর পুরাতন আশ্রমে আমার দীক্ষা হয়। মাননীয় ৺হর গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয় (পেন্সন প্রাপ্ত সব জজ) বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন দেখিয়াছি, কিন্তু এবার পুরী গিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম কাশীতে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ কালে একটা ষাঁড় তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাতে তাঁহার চলৎশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে আশ্রমে থাকা অসম্ভব হওয়ায় তিনি এখন নিজ বাটীতে থাকেন। এক্ষণে ৺দুর্গাকান্ত রায় (পেন্সন-প্রাপ্ত সব জজ) দাদা মহাশয় আশ্রমে থাকিয়া বাবার সেবা ও আশ্রম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে আমাকেও তাঁহার কিছু কিছু সাহায্য করিতে হইত।

একদিন চল্লিশ পয়তাল্লিশ জন কুমারী মাতার সেবা* এবং গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণ লইয়া প্রায় ষাট জন লোকের খাওয়ার

* আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর কুমারী ভোজনের আবশ্যক হইলে বাবার পাণ্ডা চৈতন্য শৃঙ্গারীকে জানান হইত। তিনি আবশ্যক মত কুমারী পাঠাইয়া দিতেন। অল্প দিন মধ্যে কালুরাম নামক একজন সূপকার পাণ্ডা বাবার খুব ভক্ত হইয়া পড়িলেন, বাবাও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন, ঔষধ প্রস্তুতাদির জন্য কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে বরাত করিতেন। ক্রমে কুমারী আনয়নের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি আবশ্যক মত পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত কুমারী আনিয়া দিতেন। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কুমারী পাণ্ডাদের বাড়ী হইতেই আনীত হইত। এ বিষয়ে অনন্তদাস দাদা প্রভৃতি উড়িষ্যার

আয়োজন হইল। দুর্গাকান্ত দাদা বাজারের সাহায্যের জন্য আমাকে সঙ্গে লইলেন। ফর্দ্দ মত সমস্ত দ্রব্য কিনিয়া কুলীর

ব্রাহ্মণ-শিষ্যগণ আপত্তি উঠাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলেন—"জগন্নাথের পাণ্ডাগণ কেহই ব্রাহ্মণ নহেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্যাধগণের গৃহেই প্রথমে 'নীল মাধব' দর্শন করেন। তিনি যখন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় জগন্নাথ দেবের নির্দ্দেশ মত ব্যাধগণকেই তাঁহার সেবক নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমান পাণ্ডাগণ সকলেই সেই ব্যাধগণের বংশধর। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের গলায় উপবীত পরাইয়া দিয়াছিলেন। উড়িষ্যাবাসী সদ্‌ব্রাহ্মণগণ জগন্নাথের মন্দিরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু পাণ্ডাদের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ দূরে থাকুক তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না।" এ কথা কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অনেকে বলেন,—"কেবল 'দয়িতা' পাণ্ডাগণ উক্ত ব্যাধবংশসম্ভুত, শৃঙ্গারী, পুজারী, সূপকার প্রভৃতি পাণ্ডাগণ সকলেই ব্রাহ্মণ।" এ কথা বিশ্বাস করিবার সন্তোষজনক প্রমাণও আছে। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার সময় দেখিয়াছি যেন দয়িতা পাণ্ডাগণই কর্ত্তা, ইঁহারাই বিগ্রহগুলিকে স্নানমঞ্চে ও রথের উপর আনয়ন করেন, ইঁহারাই রথের উপর নৃত্য করেন। স্নানের পর ইঁহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বিগ্রহগুলির অঙ্গরাগ করেন। নব কলেবরের সময় ইঁহারা নূতন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন, পুরাতন বিগ্রহগুলিকে সমাধিস্থ করেন। তাহার পর দশ রাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া অশৌচান্ত দিনে মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌরকর্ম্ম করেন। একাদশাহে শ্রাদ্ধাদির ন্যায় কিছু ক্রিয়া করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করান। ইহার অনেক ঘটনা আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি।

এইরূপ প্রতিবাদ বাবার কাণে পঁহুছিলে তিনি (যে কোন কারণেই হউক) পাণ্ডাদের বাড়ী হইতে কুমারী গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর একবার কুমারী ভোজনের আবশ্যক হইলে বহু চেষ্টা করিয়াও চৌদ্দ পনর জনের বেশী কুমারী পাওয়া যায় নাই।

মাথায় দিয়া মিষ্টান্নের দোকানে গেলাম। কুমারী-ভোজনের রসগোল্লা কেনা হইলে দুর্গাকান্ত দাদা বলিলেন, "আশ্রমে কোন লোক আসিলে বাবা তাঁহাদিগকে জল খাইতে দিবার আদেশ করেন, তজ্জন্যে আরও কিছু মিষ্টি পৃথক্ করিয়া কেনা ভাল।" পৃথক্ করিয়া কেনা হইল বটে, কিন্তু মুটিয়ার অসুবিধার জন্য সেই হাড়িতেই মিষ্টিগুলি রাখা হইল, কথা হইল আশ্রমে গিয়া এগুলি পৃথক করিয়া লওয়া হইবে।

আশ্রমে আসিয়া দেখিলাম, কয়েকজন ভদ্রলোক বাবার নিকট বসিয়া আছেন। কি একটা সৎ-প্রসঙ্গ চলিতেছিল, আমি গিয়া বাবার কাছে বসিলাম, দুর্গাকান্ত দাদা জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ভদ্রলোকগুলি বাবাকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বাবা তাঁহার পূর্ব্ব প্রথামত জল খাওয়াইয়া দিতে আদেশ দিলেন। তখনও মিষ্টিগুলি পৃথক্ করিয়া রাখা হয় নাই, সেই হাড়ি হইতেই রসগোল্লা লইয়া তাঁহাদিগকে জল খাওয়ান হইল। ব্যাপারটি সর্ব্বদর্শী বাবার চক্ষু এড়াইল না। লোকগুলি চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই বাবা দুর্গাকান্ত দাদাকে ডাকাইলেন এবং ভদ্রলোকদিগকে কি জল খাওয়ান হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্গাকান্ত দাদা বলিলেন,—"বাবা, ভদ্রলোকদের জল খাওয়ার জন্য পৃথক্ করিয়া রসগোল্লা কেনা হইয়াছিল।" বাবা বলিলেন, —"কেনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু পৃথক্ রাখা হইয়াছিল কি ?" দুর্গাকান্ত দাদা বলিলেন,—না বাবা, পৃথক্ করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু রাখা হয় নাই। আপনার আদেশ পাইয়া ঐ হাড়ি হইতে

তুলিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।" বাবা বলিলেন,—"ওগুলি সব উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ওগুলি দিয়া আর কুমারী-ভোজন হইবে না।" তুর্গাকান্ত দাদা, অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পরদিন সকালে আবার মিষ্টি আনিয়া কুমারী ভোজন করান হইল। রসগোল্লাগুলি বাবার ভোগেও লাগিল না, সুতরাং শিষ্যদেরও খাওয়া হইল না। শেষে পথের ভিখারী ও কাঙ্গালী ডাকিয়া মিষ্টান্নগুলি বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল।

আমাকে এখনও অনেকবার কুমারী-ভোজন ও ঠাকুরদের ভোগের জন্য ফল মিষ্টি প্রভৃতি ক্রয় করিতে হয়। দোকানদারগণ আমাকে খাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে বলে; কিন্তু খাইবার কথা উঠিলেই আমি যেন শুনিতে পাই, বাবা বলিতেছেন ,—সাবধান, খাইলে উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইবে, ভোগে লাগিবে না। পরীক্ষা করিয়া না লওয়ার জন্য অনেক সময়ে ঠকিতে হয়, কিন্তু খাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি না।

(৩)

এই ঘটনার আরও কয়েক বৎসর পরের কথা। তখন পুরীর আশ্রমে তেতালাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। নীচের তালায় ও দোতালায় দুইখানি করিয়া ঘর, দক্ষিণ দিকে বারাণ্ডা। ত্রিতলে বাবার জন্য একখানি ঘর, পূজার ঘর ও বাথ-রুম। বাবা উপরের ঘরে থাকেন এবং বিকাল বেলায় শিষ্যগণকে লইয়া দোতালা বারান্দায় বসেন। শিষ্যগণ কেহ দোতালায়, কেহবা নীচের তালায় আসিয়া থাকেন। বাবা তাঁহার নিয়ম মত দু-বেলা পায়ে

হাঁটিয়া কখনও মন্দিরের দিকে, কখনও সমুদ্র-তীরে, বেড়াইতে যান। তাঁহার জন্য নীচের তালার বারাণ্ডায় একটি ইজি-চেয়ার পাতা থাকে। বাবা বেড়াইয়া আসিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করেন, তাহার পর উপরে উঠিয়া যান। বাহিরের কোন লোক আসিলে ঐখানে বসিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে আবশ্যকীয় কথোপকথন করেন।

বাবা একদিন বেড়াইয়া আসিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন, আমি নিকটেই দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় একটা মাছি উড়িয়া আসিয়া বাবার বাম বাহুতে বসিল। বাবা সেইদিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই বেটা মলো গো।" বাবার কথা শুনিয়া আমি সেই দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—মাছিটির পা এবং পালক পুড়িয়া গিয়াছে, ধরটা কাল হইয়া গিয়াছে। পা নাই, তথাপি হাত নড়াইলেও পড়িয়া যাইতেছে না, যেন আটা নিয়া জড়ান আছে। বাবা ডাইন হাত দিয়া মাছিটাকে তুলিয়া লইলেন এবং হাতের তালুর উপর রাখিয়া হাতটি আস্তে আস্তে দোলাইতে লাগিলেন, মাছির ধরটা হাতের তালুর উপর গড়াইতে লাগিল। আমি—'দেখি বাবা' বলিয়া ঐটি লইবার জন্য হাত বাড়াইলাম, বাবা তাড়াতাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—'ছুঁইও না।' তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় ঐটিকে হাতের তালুর উপর গড়াইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মাছির পা গজাইল এবং সে পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরেই দেখি পালকও বাহির হইয়াছে। মাছিটা তাহার পেছনের পা দিয়া কয়েকবার পালকগুলি মুছিয়া লইয়া উড়িয়া গেল।

বাবার শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে অসংখ্য মশা, মাছি, ছারপোকার মরার কথা বহুবার শুনিয়াছি এবং ইন্দুর, চামচিকা স্বষ্টির কথাও শুনিয়াছি, কিন্তু চক্ষে দেখি নাই। মৃত জীবের প্রাণদান দেওয়া কোনদিন শুনিও নাই। তাই একটি মাছির প্রাণদান দিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। বাবাকে শ্রীমুখে বলিতে

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বহুদিন পূর্ব্বের ঘটনা, কেবল স্মরণ-শক্তির সাহায্যে লিখিত হইল। যে সকল ঘটনার বিবরণ লিখিলাম তাহা অনেক গুরুভ্রাতা স্ব-চক্ষে দেখিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অনেকে জীবিতও আছেন। তাঁহারা যদি কোন ভুল ভ্রান্তি দেখিতে পান তজ্জন্য লেখককে ক্ষমা করিবেন। বিশেষ কিছু ত্রুটি বা ওলট-পালট দেখিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রের দ্বারা জানাইবেন। পরের "বিশুদ্ধবাণী"তে তাহা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিব। তজ্জন্য কেহ লজ্জা বা আলস্য করিবেন না। এমন একদিন আসিতেছে যেদিন বাবার মহৎ জীবনের যোগৈশ্বর্য্য ও লীলার কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়া পৃথিবীময় প্রচারিত হইবে। আমরা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। সেগুলি যেন মিথ্যার আবরণে আবৃত না হয়।

আর একটি নিবেদন—বাবার সকল শিষ্য, শিষ্যা ও ভক্তের নিকট বাবা কিছু না কিছু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে সেই লীলা-কথাগুলি "বিশুদ্ধবাণী" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া জগন্মাঝারে বাবার মহা-মহিমা প্রকাশের সহায়তা করুন। আপনি ভাল লিখিতে পারেন না বলিয়া সঙ্কোচ প্রকাশ করিবেন না। আপনি যেমন করিয়া হোক্ ঘটনাগুলি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি শুদ্ধ ভাষায় লিখিয়া তাহা "বিশুদ্ধবাণী"তে প্রকাশ করিবেন। লজ্জা বা সঙ্কীর্ণতার জন্য যেন অমূল্য রত্নরাজি মৃত্তিকা-গর্ভে চির-প্রোথিত না থাকিয়া যায়। "আমার

শুনিয়াছি, "তাঁহারা (গুরুবর্গ) অনুমতি করিলে এইরূপ আর একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া দিতে পারি।" সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বাবার পক্ষে একটা ক্ষুদ্র মক্ষিকার প্রাণদান দেওয়া অতি নগণ্য ব্যাপার। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার শক্তির পরিমাণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

জয় গুরু !

ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র" ভাবিয়া প্রবন্ধ পাঠাইতে বিরত থাকিবেন না। বাবার কথা যত কম হউক না কেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। "বুন্দে বুন্দে (ফোঁটা ফোঁটা জলে) তালা ভরে" এবং "কাঠ বেড়ালের সাগর বাঁধার" কথা স্মরণ করিয়া সকলেই সোৎসাহে সৎকার্য্যের সহায়ক হউন।

দেহ ও কর্ম্ম

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

তৃতীয় প্রস্তাব

জ্ঞানগঞ্জ রহস্য

(১)

দেহ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বের দুইটি প্রস্তাবে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও বহু কথা আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ আলোক প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ দেহ ও কর্ম্ম তত্ত্বের সহিত জ্ঞানগঞ্জের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে এই বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

সিদ্ধভূমি অনেক আছে—শাস্ত্র পাঠে তাহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন শক্তিশালী মহাত্মা নিজের জীবনে ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কথিত আছে যে, জ্ঞানগঞ্জ আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর একটি গুপ্ত স্থান বিশেষ—কিন্তু উহা এমন গুপ্ত যে, বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ না হইলে এবং ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা না হইলে এই মর্ত্ত্য জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না। সিদ্ধভূমি মাত্রেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধভূমি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও যে সকল জীব ঐ স্থান হইতে কোন প্রকার শক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত না হয় তাহাদের

পক্ষে উহার দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন সিদ্ধভূমির স্বরূপ, পরিস্থিতি ও ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধভূমি, দিব্য ভূমি প্রভৃতি অলৌকিক জীব-নিবাস-স্থান সকলকে এক বর্গেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাদের পরস্পর ভেদ ও প্রত্যেকটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। গোলোক ধাম, নিত্য বৃন্দাবন, কৈলাস, নিত্য সাকেত প্রভৃতি স্থানের মহত্ত্ব বিভিন্ন প্রকার। এই জাতীয় বিশিষ্ট স্থান মায়িক জগতে বিভিন্ন স্তরে বহু আছে, মায়ার ঊর্দ্ধেও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কেদারেশ্বর, জল্পেশ্বর, মহাকাল এবং শ্রীশৈল—এই সকল ভুবন তেজঃ তত্ত্বে বিদ্যমান আছে। উহারই অংশ অবলম্বন করিয়া যোগিগণ পৃথিবীতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঐ সকল নাম দিয়া তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। তদ্রূপ অট্টহাস, কনখল, কুরুক্ষেত্র ও গয়া—এইগুলি বায়ু তত্ত্বের ভুবন। অবিমুক্ত, গোকর্ণ, স্থাণু—আকাশ তত্ত্বের ভুবন। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে। মলিন মায়ার ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধ মায়া-রাজ্যেও অনেক ভুবন আছে, যাহাদের প্রতিরূপক পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে অনাস্রব ধাতুতেও বিভিন্ন বুদ্ধ-ক্ষেত্র ও দিব্য ধাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে ঊর্দ্ধলোকের প্রায় সমস্ত স্থানই আংশিক ভাবে অবতীর্ণ ও প্রকট রহিয়াছে—এই সকল অংশকে অবলম্বন করিয়া অল্প আয়াসেই মূল স্থানকে প্রকাশ করা যায়। এই জন্য আমাদের এই সুপরিচিত বৃন্দাবন হইতেও নিত্য বৃন্দাবনের সন্ধান

প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই জাগতিক দৃষ্টি গোচর কাশী হইতেও সুবর্ণময় শঙ্করের ত্রিশূলে প্রতিষ্ঠিত নিত্য কাশীর দর্শন লাভ করা যায়। সর্ব্বত্রই অচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়াছে।

জ্ঞানগঞ্জের আলোচনা কালে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই স্থান সাধারণ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় নহে। ইহা যদিও গুপ্ত ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তথাপি ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুদূরে। প্রকৃত যোগী ভিন্ন এই স্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না, ইহাতে প্রবেশ-লাভ করা ত দূরের কথা। তবে অধিকারিগণের অনুগ্রহ হইলে এই জগতের সাধারণ মানুষও সেখানে যাইতে সমর্থ হয়। ভৌম জ্ঞানগঞ্জ কৈলাসের পরে এবং ঊর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও উহা সাধারণ পর্য্যটকের গতিবিধির অতীত। জ্ঞানগঞ্জ, রাজরাজেশ্বরী মঠ, এবং পরম গুরুদেবের শ্রীমন্দির স্তর-বিন্যাসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। জ্ঞানগঞ্জই সকলের নিম্ন স্তর, রাজরাজেশ্বরী মঠ মধ্য স্তর এবং পরম গুরু মহাতপার স্থান সর্ব্বোচ্চ। এই স্থানটি যোগি-নির্ম্মিত। ইহা সৃষ্টির আদিতে লোকস্রষ্টার সৃষ্টিরূপে প্রকট হয় নাই। ধ্রুব-লোক যেমন সাধক-বিশেষের তপস্যার ফলে কাল-বিশেষে প্রকট হইয়াছে, গোলোক যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণের সঙ্গে সংসৃষ্ট উচ্চতম নিত্য ধাম, সুখাবতী যেমন অনাস্রব ধাতুতে অমিতাভ বুদ্ধের বিশুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানগঞ্জও তেমনি যোগি-বিশেষের তীব্রতম যোগসাধনার প্রভাবে বিশ্ব-কল্যাণের মহালক্ষ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নিত্য হইয়াও উহা নিমিত্ত যোগে প্রকট হইয়াছে।

ব্রাহ্মী সৃষ্টির সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটি কি তাহার আলোচনাই দেহ ও কর্ম্মের তত্ত্ব-আলোচনা। এইবার সেই কথাই সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

(২)

কর্ম্মের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আমরা এখানে শুধু সাধক ও যোগীর কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যাহারা সাধক নয়, যোগীও নয়, তাহাদের কর্ম্মের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া সাধকের একমাত্র লক্ষ্য। প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে শ্রাবকদের যে স্থান আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে সাধকদিগের স্থানও কতকটা তাহারই অনুরূপ। সাধক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সেই জ্ঞানের অনলে অশুদ্ধ বাসনা দগ্ধ করিয়া মায়িক উৎপত্তির মূল-বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ফলে সে জন্ম-মরণের অতীত কৈবল্য-স্থিতির মতন স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার পতন হয় না ইহা ঠিক, কিন্তু সে আর উর্দ্ধেও উঠিতে পারে না এবং পূর্ণ ভগবত্তার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সাধকের লক্ষ্যও যেমন ক্ষুদ্র, তাহার আধারও তেমনি ক্ষুদ্র। সে গুরুর তীব্র শক্তি ধারণ করিতে পারে না, তাই গুরু তাহাকে তাহার সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞানই প্রদান করেন।

এই যে জ্ঞান প্রদানের কথা বলা হইল ইহার সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সদ্‌গুরু সাধককে শক্তি-পাত কালে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করেন

যাহাতে তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধগতি অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যে সকল অশুদ্ধ বাসনা সাধকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইগুলি গুরু-কৃপাতে কুণ্ডলিনী-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে সাধকের অন্তরাত্মা শুদ্ধ হইয়া গুরুদত্ত চিন্ময়ী শক্তি-স্বরূপ ইষ্টের আকার ধারণ করে। ইহা ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য সাধকের দীক্ষার পর তাহার যথাবিধি নিজ কর্ম্ম-প্রভাবে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ চৈতন্যরূপে আত্মবিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে চিন্ময়ত্ব দান করে। অশুদ্ধ বাসনা দূর করাই চিৎশক্তির কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে হইতে নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে ইষ্ট-স্বরূপ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু উহা সাধকের দর্শনগোচর হয় না। কারণ অশুদ্ধ বাসনার কিঞ্চিৎ অবশেষ বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধ বস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে অশুদ্ধ সত্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে না থাকিলে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আত্মসত্তা রক্ষা করা অসম্ভব। এই শোধন-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে মলিন বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে উহা একেবারেই থাকে না। তখনই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহপাত হয়। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় মানে এই যে সাধক তখন বাসনামুক্ত হইয়া নিজকে ইষ্টের সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে। ইহাই এক হিসাবে তাহার ইষ্ট-দর্শন এবং অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাই তাহার আত্মদর্শন।

গুরু-কৃপাকে সহায় করিয়া সাধক নিজ শক্তির প্রভাবে

সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে এবং সিদ্ধাবস্থায় চিদাকাশে স্থিতি প্রাপ্ত হয়। তখন সে বাসনা-মুক্ত চৈতন্যময় আত্মা মাত্র—তাহাতে কোন শক্তির বিকাশ থাকে না এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। কিন্তু যে সাধক এই প্রকার দেহাবস্থায় থাকিতে থাকিতে সাধন-কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে না পারে তাহার পক্ষে এই প্রকার মরণান্তে চিদাকাশে স্থিতি ঘটে না। সেই সাধক অপূর্ণ নিজের কর্ম্মকে পূর্ণ করিবার অবসর আর পায় না, কারণ সাধকের তো আসন নাই। বর্ত্তমান দেহ ত্যাগের পর আসন-প্রাপ্তির অভাবে সাধক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তাহার অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হয়। এই দেহে থাকিতে থাকিতে যাহার যতটা বিকাশ হইয়াছিল সে সেইখানেই নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে। প্রকৃতির স্রোতে তাহাকে অর্থাৎ তাহার তত্ত্বকে চিদাকাশের দিকে টানিয়া লইয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু সাধক নিজে উহা বুঝিতে পারে না।

যোগীর আধ্যাত্মিক গতি ঠিক এই প্রকার নহে। জন্ম-কাল হইতেই যোগীর আধার অধিকতর শুদ্ধ। এইজন্য সদ্‌গুরু তাহাকে যোগ-দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার ফলে সঞ্চারিত শক্তির মাত্রা তীব্র হয় এবং অগ্রগতির পদ্ধতিও ভিন্ন হয়। আধার পরিপক্ক না হইলে তীব্রশক্তি ধারণ করা যায় না এবং তীব্রশক্তির ক্রিয়া ভিন্ন পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভও হয় না। যোগীর উপলব্ধ শক্তি শুধু যে পরিমাণে তীব্র তাহা নহে, তাহার প্রকৃতিও ভিন্ন। এই শক্তির প্রভাবে শুধু যে মলিন বাসনাদি-সংস্কার দগ্ধ হয় তাহা নহে, উহা শোধিত হইয়া যোগীর সহায়করূপে

তাহার নিত্য সাথী হয়। সাধকের ক্ষেত্রে ভগবদনুগ্রহে প্রতিকূল শক্তি প্রতিকূল ভাব পরিত্যাগ করিয়া তটস্থ রূপ ধারণ করে, কিন্তু যোগীর ক্ষেত্রে শুধু যে শক্তির প্রতিকূলতা নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, উহা অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত হয়। এই অনুকূল শক্তি তখন যোগীর আত্মশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সাধক সাধনার পরিসমাপ্তিতে নিরাকার চিৎস্বরূপে স্থিতি লাভ করে, কিন্তু যোগী যোগক্রিয়ার মহিমায় বিশুদ্ধ সাকার রূপে বিরাজ করে। যোগী কখনই নিরাকার অথবা কায়হীন থাকে না। সাধকের কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতে যোগীর কুণ্ডলিনী জাগরণও অনেকাংশে পৃথক্। সাধক গুরুদত্ত শক্তি মূলধন রূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে নিজ কর্ম্মদ্বারা সংবর্দ্ধিত করে—তাহার ফলে উক্ত শক্তিরূপ চিদগ্নি দ্বারা তাহার মলিন বাসনাদি ক্রমশঃ দগ্ধ হইয়া যায় এবং চরমাবস্থায় বাসনাদির পূর্ণ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধন-কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় এবং সাধক ইষ্ট-স্বরূপে নিজকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার সিদ্ধি —ইহা বিদেহ অবস্থা। বাসনা-নিবৃত্তির আনুষঙ্গিক ফল দেহপাত। পক্ষান্তরে যোগীকে কর্ম্মদ্বারা চিৎশক্তি হইতে চিন্ময় আকার গঠন করিতে হয় না। যোগী উচ্চ অধিকার সম্পন্ন বলিয়া দীক্ষাকালেই গুরুদত্ত চিদাকার প্রাপ্ত হয়। যোগীর কর্ত্তব্য চিৎ-শক্তিদ্বারা আকার রচনা নহে, কিন্তু কর্ম্মবলে গুরুদত্ত চিদাকারের সহিত সংঘর্ষ করিয়া মলিন বাসনাকে শোধনপূর্ব্বক উহাকে অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত করা। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এই চিন্ময় আকারকে যোগী নিজের সহিত অভিন্নরূপে বোধ করে, কিন্তু যোগী ইহাকেও অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়। অর্থাৎ যোগী এই

চিন্ময় আকার প্রাপ্ত হইয়া উদ্‌বৃত্ত রূপে ইহার সাক্ষী ও নিয়ামক হয়। এই আকার বস্তুতঃ মহাশক্তি বিশ্বজননীরই আকারবিশেষ। যোগী নিজ স্বরূপে এই আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ইহার পূর্ণত্ব সাধনে তৎপর থাকে। এই পূর্ণতার প্রাপ্তিগত মাত্রার উপরেই তাহার বিশ্বকল্যাণ-সাধনের মাত্রা নির্ভর করে।

সাধক সঙ্কুচিত, কিন্তু যোগী উদার। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তিই সাধকের লক্ষ্য, কিন্তু যোগীর লক্ষ্য শুধু নিজের দুঃখ-নিবৃত্তি নহে। কারণ যোগী পরার্থসেবক বলিয়া নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও অবলম্বন করেন। তাই যোগী ভিন্ন অন্য কেহ যথার্থ গুরু হইতে পারে না।

(৩)

সাধক ও যোগীর স্বরূপ ও ক্রিয়া ভেদ সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু সকল যোগীই এক প্রকার নহে। যোগীর সামান্য লক্ষণ প্রত্যেক যোগীতেই বিদ্যমান থাকে ইহা সত্য, কিন্তু লক্ষ্যগত তারতম্যও অবশ্যই থাকে। এই দৃষ্টি অনুসারে যোগীকে খণ্ড ও অখণ্ড দুই ভাগে বিভাগ করা যায় এবং খণ্ড যোগীকেও খণ্ড ও মহাখণ্ড এই দুই ভাগে বিভাগ করা চলে। এই বিভাগের ফলে খণ্ড, মহাখণ্ড ও অখণ্ড এই তিন প্রকার যোগীর তত্ত্ব আমাদের আলোচনার বিষয়। খণ্ড যোগী এমন একটি উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া যোগ-মার্গে অগ্রসর হয় যাহা চিদাকাশের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। যে চিদাকাশ সাধকের কর্ম্ম-সমাপ্তি-স্থান বলিয়া পরম লক্ষ্য তাহাকে ভেদ করিতে না পারিলে এই যোগীর লক্ষ্য-স্থানে উপনীত হওয়া যায় না। ইহা অতি উচ্চাবস্থা এবং জাগতিক

দৃষ্টি অনুসারে পরমেশ্বরত্ব এই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। খণ্ড যোগের লক্ষ্য কর্ম্ম-প্রভাবে এই ভূমি প্রাপ্ত হওয়া। আমরা মহাখণ্ড ও অখণ্ড যোগের কথা পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ খণ্ড যোগের রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

খণ্ড যোগের লক্ষ্য যে যোগভূমি তাহা যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত না হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। কারণ দীক্ষার পর কর্ম্মের অভিব্যক্তি আবশ্যক। দীক্ষা দ্বারা ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইবার অধিকার-বীজ হৃদয়ে নিহিত হয়, কিন্তু ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া, বৃক্ষ রূপে পরিণত করিয়া, পুষ্প ফল রূপে প্রকাশিত করা যোগ-কর্ম্মের অধীন। যোগী কর্ম্মহীন অথবা কর্ম্মে উদাসীন হইলে গুরু প্রদর্শিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। দীক্ষা-কালে গুরু কৃপা অথবা অনুগ্রহ-শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিকে পূরণ করিতে হয় নিজের পুরুষকার অথবা কর্ম্মের দ্বারা। এই কর্ম্ম কৃপা দ্বারা পরিচালিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্ম কর্ম্মই, কৃপা কৃপাই। কর্ম্মের প্রয়োজন কৃপা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। যদি কোন খণ্ড যোগী গুরু অর্থাৎ সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কৃপা-শক্তি প্রাপ্ত হয় অথচ নিজে অনুরূপ কর্ম্ম না করে তাহা হইলে তাহাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ গুরু যে মহালক্ষ্য তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিবার পূর্ণ অধিকার গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়াও সে কর্ম্মগত অলসতা বশতঃ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবনের কাল পরিমিত। এই পরিমিত সময়ের মধ্যে কর্ম্ম সমাধা করা আবশ্যক। কারণ দেহত্যাগের পর বিদেহ অবস্থায় কর্ম্ম-দেহের সহিত যোগ না

থাকার দরুণ কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে না এবং যোগ-পথের অগ্রগতিও স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে। এই রক্ত মাংসের দেহে থাকিতে থাকিতে কর্ম্ম সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক। নতুবা লক্ষ্য-প্রাপ্তির আশা এক প্রকার সুদূর-পরাহত। মরদেহে কর্ম্ম করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া যায়। কর্ম্ম সমাপ্ত না করিয়া স্রোতে ভাসিয়া লক্ষ্য ভূমিতে যাইয়া পৌঁছিলেও তাহার বিশেষ মূল্য নাই। কারণ তখন কমলের বিন্দুতে স্থান লাভ হয় না, দলে আপন যোগ্যতানুসারে স্থান প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ দলে বসিবার অধিকার হওয়াও কঠিন। দলের বাহিরে জ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়।

কিন্তু যোগী গুরু শিষ্যকে যোগ-দীক্ষা দিবার পর তাহাকে আশ্রয় স্বরূপ আসন দান করিয়া থাকেন। এই আসন দান একটি রহস্যময় ব্যাপার। আসন দিলেই বুঝিতে হইবে তাহাকে নিরন্তর কর্ম্ম করিবার অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু আসন বিস্তার করা হয় ভূমির উপর। তাই গুরুকে আসন দানের সঙ্গে সঙ্গে আসন বিছাইবার জন্য ভূমিও দান করিতে হয়। কিন্তু এই ভূমি কোথায়? যোগী শিষ্য যখন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে দেহত্যাগের পরেও তাহার আত্মিক সত্তা নিরালম্ব অবস্থায় উড্ডীন ভাবে বিদ্যমান থাকিবে না। উহা ভূমিতে বসিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে। এই ভূমিতে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম অতি দীর্ঘকাল-সাধ্য, কারণ ইহা মর-দেহের কর্ম্ম নহে। কিন্তু মরদেহ না হইলেও ইহাও কর্ম্ম-দেহ যদিও এই কর্ম্ম-দেহে ক্ষিপ্রবেগে কর্ম্ম

সিদ্ধ হয় না। যোগী শিষ্য মৃত্যুর পর অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যে বিশুদ্ধ ব্যাপক ভূ-খণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহাকে গুরুধাম বলা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রতি যোগী আপনাপন আসনে আসীন হইয়া কর্ম্মে নিরত রহিয়াছে। সুদীর্ঘ কালে ঐ কর্ম্মের প্রভাবে যোগীর যোগ-চক্ষু উন্মীলিত হয়। বস্তুতঃ তখনই যোগীর প্রকৃত যোগ-পথ খুলিয়া যায়। ঐ পথে চলিবার সময় গুরুধামের কায়াও আর থাকে না। তখন দৃষ্টিময় দিব্য স্বরূপে মধ্য রেখা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমশঃ চলিতে চলিতে চিদাকাশ ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়। লক্ষ্যস্থান বলিতে এখানে কমলের কোন না কোন একটি দল বুঝিতে হইবে—কর্ণিকা নহে। কমলের কর্ণিকাতে যাইবার অধিকার একমাত্র তাহারই আছে যে নরদেহে থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বত্রই নরদেহের কর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব না থাকিলে কমলের কর্ণিকাতে বসিবার যোগ্যতা লাভ হয় না। কর্ণিকাতে বসা মানেই অঙ্গিরূপে বা অঙ্গরূপে চক্রের অধিষ্ঠাতা হওয়া অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হওয়া কিম্বা রাজার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করা। দলে বসা মানে সাধারণ প্রজার ন্যায় বিন্দুর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রজারূপে নিজের স্থান প্রাপ্ত হওয়া। উভয়ে অনেক পার্থক্য আছে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পরে গুরুস্থানে গতি হয় এবং সেখানে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিজ-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিদ্ধভূমি অধিকাংশ স্থলে এই গুরুস্থানের অন্তর্গত। অবশ্য ইহার বাহিরেও যে সিদ্ধভূমি না আছে তাহা নহে। গুরুধাম হইতে যে গতি লাভ হয়,

যাহা খণ্ড যোগীকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে দেহভেদ সিদ্ধ হয় না এবং প্রকৃত মধ্য রেখাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথাটি অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু বুঝিতে না পারিলে বক্তব্যের অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে না। স্বয়ং বিশ্ব-জননী কোন না কোন রূপ ধরিয়া উন্মীলিত-যোগ-চক্ষু যোগীর নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সাধক ত প্রাপ্ত হয়ই না, খণ্ড যোগীও প্রাপ্ত হইতে পারে না। খণ্ড যোগী আভাস মাত্র লাভ করে। তবে এই আভাসেরও তারতম্য আছে। যোগ-চক্ষু উন্মীলনের পরেই বিশ্ব-জননীর যে রূপ ও রাজ্য প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব্ব নিম্নস্তরের। ঐ রাজ্যে সাধকও আসিতে পারে এবং আসিয়াও থাকে, কিন্তু সে মায়ের স্বরূপ-দর্শন পায় না। দুর্ব্বল খণ্ড যোগী স্বরূপ-দর্শন পায় বটে, কিন্তু সেইখানেই বিশ্রাম লাভ করে। তাহার অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পরে যে রাজ্যটি আছে সেটিও বিশ্ব-জননীরই রাজ্য। সেখানেও কমলের দলে বিশ্ব-জননীরই আসন, কিন্তু ঐটি মধ্যম খণ্ড যোগীর আদর্শ। তিনি উহার দর্শন পান এবং ঐখানেই থাকিয়া যান। সাধকের উহাই চরম লক্ষ্য, কিন্তু সাধকের স্থিতি এবং যোগীর স্থিতি একই স্থানে বিভিন্ন হইয়া থাকে। খণ্ড যোগীর মধ্যে যিনি উত্তম তাঁহার আদর্শ চিদাকাশের উর্দ্ধে, যাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মর-দেহে কর্ম্মের সমাপ্তি না হইলে কেন্দ্রে যাইয়া মাতৃ-অঙ্কে উপবেশন করা যায় না।

বিশ্ব-জননীর এই যে তিনটি রূপের কথা বলিলাম এই তিনটিই তাঁহার স্বরূপের ছায়া, অনুছায়া এবং প্রতিচ্ছায়া,—কোনটিই

প্রকৃত স্বরূপ নহে। কিন্তু যে খণ্ড যোগী অথচ পূর্ণ কর্ম্মী সে ছায়াটি প্রাপ্ত হয়, অবশ্য নরদেহে কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে। কারণ রক্তহীন দেহে কর্ম্মের সেই পরিমাণ সংবেগ উৎপন্ন হয় না যাহাতে মধ্য বিন্দুতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয়। যোগীর এই যোগভূমিতে ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ভাবেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু মহাজ্ঞান আসে না। কারণ খণ্ডযোগের চরম উৎকর্ষের অবস্থাতেও মহাজ্ঞান উদিত হয় না।

মহাজ্ঞান সেই রাস্তায় প্রকাশিত হয় যাহা নিজ কায়া ভেদ করার পর উন্মুক্ত শুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। এই পথের যাত্রী অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ যে সকল যাত্রী খণ্ডযোগের পথে চলে তাহারা ঠিক ঠিক এই পথ চেনে না এবং এই পথের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বজননীর স্বরূপ দর্শনের আশা অলীক কল্পনামাত্র। প্রত্যেক পথেই আদি বিন্দু হইতে অন্তিম বিন্দুটি দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে! খণ্ড-যোগীর দৃষ্টির সম্মুখে অন্তিম বিন্দুরূপে চিদাকাশের উর্দ্ধস্থ মহাভূমি লক্ষিত হয়, তাহার পরে অথবা বাহিরে আর যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে তাহা ধারণাতে আসে না। কিন্তু মহাখণ্ড-যোগীর দৃষ্টিতে যে পথটি ভাসে তাহা পূর্ব্বোক্ত পথ হইতে ভিন্ন। কারণ এই পথের অন্তিম কোটিতে বিশ্ব-জননীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্য খণ্ড-যোগীর পরম আদর্শেরও উর্দ্ধস্থিত, ও তাহার দৃষ্টির অগম্য। তাহার লক্ষ্য বিশ্ব-জননীর স্বরূপ হইলেও বস্তুতঃ উহা এই মহাস্বরূপেরই প্রথম ছায়া মাত্র। ইহার যেটি ছায়া বা অনুছায়া তাহাই সাধকের সিদ্ধ অবস্থার লক্ষ্য। দ্বিতীয় ছায়ার যেটি প্রতিচ্ছায়া

সেইটি নিম্নস্তরের খণ্ডযোগীর লক্ষ্য। তাহা হইতে যে রশ্মি নির্গত হইয়াছে তাহাই অখণ্ডভাবে প্রসারিত হইয়া সমগ্র সাধক-কুলের ধ্যেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

অধ্যাত্ম মার্গে কৃপা ও কর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য। সাধকের জীবনে কৃপার স্থান প্রধান এবং কর্ম্মের স্থান গৌণ। বস্তুতঃ সাধকের প্রকৃত কর্ম্ম এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। যাহা কর্ম্মরূপে প্রতীত হয় তাহা কর্ম্মের আভাসমাত্র। পক্ষান্তরে যোগীর যোগ-পথে কর্ম্মই প্রধান—অবশ্য কৃপা সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু কৃপা অপেক্ষা কর্ম্মেরই মহিমা অধিক। ইহার মধ্যেও খণ্ড ও মহাখণ্ডযোগে কর্ম্মের প্রাধান্য ও উৎকর্ষ থাকিলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কৃপাই প্রধান। কিন্তু অখণ্ডযোগে কৃপা গৌণ, এমনকি স্থূলতঃ লুপ্তপ্রায়, কিন্তু কর্ম্মই আপন প্রাধান্য লইয়া খণ্ড কৃপাকে অভিভূত রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কর্ম্ম এই ভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণ পুরুষকার প্রকটিত হয় এবং মহাকৃপা আত্মপ্রকাশ করে। মহাকৃপা ও পরম পুরুষকার অভিন্ন রূপে একই ক্ষণে ফুটিয়া উঠে।

খণ্ড যোগী যেমন দীক্ষা-কালে আসন প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ মহাখণ্ড যোগীও আসন প্রাপ্ত হয়। তবে ইহা উচ্চতর আসন। খণ্ড যোগী স্ব-কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে দেহান্তে একটি ভুবন প্রাপ্ত হয় যেখানে স্থিত হইয়া নিজ নিজ আসনে কর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে এবং কর্ম্ম-সমাপ্তির পর নেত্র উন্মীলিত হইলে দিব্য দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়া যায় ও উহাকে অবলম্বন করিয়া চিদাকাশের উর্দ্ধস্থ ভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়।

মহাখণ্ড যোগী উচ্চতর লোক হইতে সমাগত। তিনি উর্দ্ধতর ভূমির সন্ধান পান এবং তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে যথাসময়ে উক্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। খণ্ড যোগীর লক্ষ্য হইতে মহাখণ্ড যোগীর লক্ষ্য বিশাল। খণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্যের পর হইতে মহাখণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্য পর্য্যন্ত যে মার্গ দৃষ্ট হয় তাহা এক প্রকার অভিনব আবিষ্কার। আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অখণ্ড যোগে এই বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীত মহাসত্তার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এই স্থানে উত্থাপিত করা সঙ্গত নহে।

মহাখণ্ড যোগ-দীক্ষার পর পরম প্রকৃতির স্নেহময় উৎসঙ্গে উপবেশন করিবার অধিকার জন্মে। অবশ্য ইহা কর্ম্ম-সাপেক্ষ, কিন্তু যে যোগী মরদেহে কর্ম্ম সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করে সে খণ্ড যোগীর ন্যায় এমন একটি আসন প্রাপ্ত হয় যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে প্রকৃতির উর্দ্ধদেশে একটি সিদ্ধ স্থান লাভ করে, যেখানে নিজ আসন বিছাইয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। এই সিদ্ধ স্থানটি তিব্বতীয় গুপ্ত যোগিগণের পরিভাষাতে 'জ্ঞানগঞ্জ' নামে প্রসিদ্ধ। এই জ্ঞানগঞ্জ সিদ্ধ ভূমি এবং পূর্ব্ব-বর্ণিত গুরুধামও সিদ্ধ ভূমি, কিন্তু উভয়ে ভেদ আছে। গুরুধামে অপূর্ণ খণ্ড যোগী কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—এই স্থানই তাহার গুরুদত্ত আসন। তদ্রূপ জ্ঞানগঞ্জে অপূর্ণ মহাখণ্ড যোগী আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—ইহাই তাহার আসন-প্রাপ্তি। বস্তুতঃ দীক্ষাকালেই এই আসন অথবা

উপবেশন-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও ইহা দীক্ষাকালে দীক্ষার্থী অথবা দীক্ষিতের নেত্রগোচর হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যোগীর সাধন-জীবনে কর্ম্মই প্রধান, সুতরাং এই জীবনে গুরু হইতে যে কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সম্যক্ প্রকারে শোধ করিয়া ফেলিতে হয়। কৃপায় নিজ শক্তির বিকাশ স্থগিত থাকে, অথচ সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় কৃপা ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই। এই জন্য যোগীর পক্ষে নিয়ম এই যে গুরু হইতে কৃপা গ্রহণ করিয়া পরে উহা স্ব-কর্ম্ম দ্বারা গুরুকে শোধ করিতে হয়। গুরুদত্ত কৃপা ঋণ রূপে গ্রহণ করিয়া নিজের অর্জ্জিত কর্ম্ম দ্বারা উহাকে মিটাইয়া ফেলিতে হয়। তখন ভবিষ্যৎ কর্ম্মের পথ সুপ্রশস্ত হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। গুরুর প্রধান কাজ শিষ্যকে কালের রাজ্য হইতে উদ্ধার করা। সাধন-মার্গে ইহা সম্পন্ন হয়, যোগ-মার্গেও হয়। কিন্তু সাধন-মার্গে শুধু কালের উত্তাল তরঙ্গ হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিয়াই গুরুর করুণা নিবৃত্ত হয়, তাহাকে কালাতীত কোন উচ্চ-পদে অভিষিক্ত করিতে পারে না। যোগ-পথে কর্ম্মের প্রাধান্য থাকে বলিয়া কালাতীত রাজ্যে যোগী বিশিষ্ট অধিকার-সম্পন্ন স্থান প্রাপ্ত হয়। খণ্ড-যোগীর অধিকার হইতে মহাখণ্ড-যোগীর অধিকার শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার অখণ্ড-যোগীর—যাহা এখনও জগতে প্রকাশিত হয় নাই। অখণ্ড-যোগীর মহান্ অধিকারই সমগ্র বিশ্বকে সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ।

সাধকের কর্ম্মের সমাপ্তি আছে, কিন্তু যোগীর কর্ম্মের সমাপ্তি

নাই। যোগী পূর্ণত্ব লাভ করিয়াও ক্রিয়াহীন হইয়া বসিয়া থাকে না। তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম চিরদিনই চলিতে থাকে এবং ইহা নিবৃত্ত কখনও হয় না এবং হইতেও পারে না। তাই পূর্ণতা লাভের পরেও পূর্ণকে পূর্ণতর, পূর্ণতম প্রভৃতি ক্রমে অনন্ত অবস্থার ভিতর দিয়া উৎকর্ষণ করা, ইহাই যোগীর কর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিশ্ব-সমস্যা (The Riddle of the World) নামক গ্রন্থে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে নিরত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের ধারা অথবা ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও অনন্ত অগ্রগতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার এই বাক্য অত্যন্ত সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে এই অনন্ত অগ্রগতি অখণ্ড স্থিতির মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। স্থিতি লাভ না করিলে অনন্ত কর্ম্মের কোন অর্থই হয় না,—তখন স্থিতিই হয় কর্ম্মের লক্ষ্য। কিন্তু স্থিতির পরেও যদি কর্ম্ম রাখিতে পারা যায় তবে উহাই হয় দিব্য কর্ম্ম, যাহার অন্ত কখনই হইতে পারে না।

জ্ঞানগঞ্জের যোগ-দৃষ্টি অনুসারে তিনটি যোগ-ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রটিতে মহাভাব পর্য্যন্ত লক্ষ্য রূপে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রের ভূমিটি হয় গুরুধাম। খণ্ড যোগী কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারিলে এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ না করিতে পারিলে যে অবস্থায় স্থূল দেহের ত্যাগ হয় সেই অবস্থায় অনুরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থূল দেহ ত্যাগের পর ক্ষিপ্রগতিতে কর্ম্ম চলে না, মন্দ মন্দ ভাবে চলে। দ্বিতীয় যোগ-ক্ষেত্রটি

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, ইহার লক্ষ্য স্থান মহাভাবের অতীত, এমন কি সূর্য্য-মণ্ডলেরও উর্দ্ধস্থ। ইহা পরমা প্রকৃতির স্বরূপ-প্রকাশ। ইহার ভূমিটিই জ্ঞানগঞ্জ। মহাখণ্ড-যোগ-ক্রিয়ার অবসানে এই লক্ষ্য খুলিয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এই স্থলেও স্থূল দেহে কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে পারিলে লক্ষ্যের সন্নিহিত হওয়া সহজ সাধ্য, কিন্তু কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিলে জ্ঞানগঞ্জ হইতে কর্ম্মের গতি চলিতে থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় এই গতিও অপেক্ষাকৃত মন্দ, স্থূল দেহের কর্ম্মের ন্যায় ক্ষিপ্র নহে।

তৃতীয় যোগ-ক্ষেত্রটি এখনও অঙ্কনের মধ্যেই পরিসমাপ্ত রহিয়াছে। ইহার ভূমি ও লক্ষ্য বিশ্ব-গুরু। কালরাজ্য বাহিরে নাই বলিয়া তখন ভূমি ও লক্ষ্যপ্রাপ্তিতে কালের কোন ব্যবধান নাই। ইহার ক্ষেত্র অখণ্ড বিশ্ব। এই স্থলেও স্থূল দেহে কর্ম্মের পূর্ণতা ব্যতীত ভূমিও লক্ষ্যপ্রাপ্তি অসম্ভব।

তিনটি ক্ষেত্রই কর্ম্মস্থান। প্রথমটির পরিধি অতি বিশাল। কালের রাজ্য এই পরিধির বাহিরে অবস্থিত। দ্বিতীয়টির পরিধি প্রথমটি অপেক্ষাও অনেক অধিক বিশাল, ইহার ফলে কালের রাজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়টির পরিধি সমগ্র বিশ্ব বা সৃষ্ট জগৎ। এই স্থলে কালের রাজ্য শূন্য রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনটি যোগ-ক্ষেত্রে কর্ম্মের তীব্রতা ক্রমশঃই অধিক। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে না পারিলে তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রতীত হইবে যে গুরুর করুণা-শক্তির মাত্রা প্রথম ক্ষেত্র হইতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রবল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র হইতে

তৃতীয় ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রবল। বস্তুতঃ ইহারই নামান্তর মহা-করুণা। শুধু তাহাই নহে, কৃপার ক্ষেত্রও ক্রমশঃ অধিক প্রসারিত হইতে হইতে তৃতীয় ভূমিতে বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

(৪)

কৃপা ও কর্ম্ম উভয়ই মূলতঃ একই শক্তি। একই অখণ্ড সত্তা অবিভক্ত থাকিয়াও নিজকে লীলাচ্ছলে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া থাকে। এই ভাবে একদিকে অণু এবং অপর দিকে মহান্, একদিকে বৃহৎ এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র, এই প্রকার দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। অণুকে মহানের নিকট যাইতে হইলে কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। অণুতে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহাই কর্ম্ম রূপে অভিব্যক্ত হইয়া অণুর অগ্রগতির সহায়তা করে। কিন্তু শুধু কর্ম্মশক্তির দ্বারা অণুর পক্ষে মহান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। মহানের কৃপা-শক্তিও অণুর সহকারী হওয়া আবশ্যক। অতএব মহানের কৃপা-সহকৃত অণুর কর্ম্মশক্তি একটি প্রধান উপায়। এই প্রকার কৃপা-শক্তির প্রাধান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে। মহানের কৃপা উদ্রিক্ত হইলেই যে অণু মহান্‌কে প্রাপ্ত হইবে অথবা মহান্ অণুকে প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা যায় না। কৃপার সহকারিরূপে অণুর কর্ম্মশক্তি অভিব্যক্ত ও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার উভয় শক্তির পরস্পর সংমিশ্রণে অণু ও মহানের যোগ সিদ্ধ হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কর্ম্ম-সাপেক্ষ কৃপা ও কৃপা-সাপেক্ষ কর্ম্ম উভয়ই আবশ্যক। অণুর প্রকৃতি ভেদে সাপেক্ষতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, নিরপেক্ষ শক্তির ক্রিয়াও

ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভবপর। ঐস্থলে উহা পূর্ণ শক্তিরই দ্যোতক, কারণ অপূর্ণ শক্তি নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই পূর্ণ শক্তি যদি কৃপা রূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐ কৃপা ধারণের উপযোগী অণুনিষ্ঠ কর্ম্ম শক্তিও উহা হইতেই প্রকট হইবে। পক্ষান্তরে এই পূর্ণ শক্তি যদি অণুর কর্ম্ম-শক্তিরূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম-শক্তির সহকারিস্বরূপ কৃপা-শক্তিকে উহা স্বয়ংই মহাকৃপা-রূপে অভিব্যক্ত করিয়া তুলে। ফলে স্বরূপে অবস্থান ও আত্মৈশ্বর্য্যের বিকাশ যথাবৎ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গভীর সমস্যা বিচারণীয় রহিয়াছে। কৃপার প্রাধান্যে মিলন ও অদ্বৈত স্থিতি ঐশ্বরিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন যেমন ঐশ্বরিক কৃপা বর্দ্ধিত হয় তেমনি তেমনি আত্মা কর্ম্মানুরূপ উর্দ্ধগতি লাভ করে ও গতির অবসানে পরমাত্ম-স্বরূপে একত্ব লাভ করে। যদি কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম্মের প্রভাবে অনুরূপ অনুগ্রহ শক্তির বিকাশে ঈশ্বর-সত্তা ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় ঈশ্বরভূত যোগীর স্বরূপে আত্মসমর্পণ করেন। এই দুইটিই অদ্বৈত স্থিতি। কিন্তু উভয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম অবস্থায় আমি তুমি রূপে পরিণত হইয়া অদ্বৈত ভাব গ্রহণ করে। তখন অবশ্য তুমি আমি একই হইয়া যায়। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে তুমি আমিতে পরিণত হয়, তাহার পর অবশ্য সেই মূল স্থিতিতে প্রবেশ হয়। কিন্তু আর একটি স্থিতি আছে। তখন আমিকে তুমির কাছে যাইতে হয় না এবং তুমিকেও আমির কাছে আসিতে হয় না। তখন আমি নিজের মধ্যেই তুমিকে খুঁজিয়া পায়, তুমিকে খুঁজিতে বাহিরে যাইতে

হয় না। তদ্রূপ তুমিও নিজের মধ্যে আমিকে খুঁজিয়া পায়, আমির জন্য তুমিকেও বাহিরে আসিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই আশ্রয়-তত্ত্ব ও বিষয়-তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। যে আশ্রয় সেই বিষয় এবং যে বিষয় সেই আশ্রয়। সুতরাং একের অভাব অপরের অভাব এবং একের প্রাপ্তি অপরের প্রাপ্তি—উভয়ে কোন ভেদ নাই। এই দুই এর সমীকরণ হইলে পরম পরিপূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন আশ্রয় ও বিষয়ের সাম্য অভিব্যক্ত হয়।

(৫)

তিনটি যোগ-ক্ষেত্রই কালের অতীত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বাহিরে কালের রাজ্য বিদ্যমান। তৃতীয় ক্ষেত্র অভিব্যক্ত হইলে কালের রাজ্য পৃথক্ ভাবে আর থাকিবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্র কালের রাজ্যের সমসূত্রে থাকিলেও ঐ দুইটি রাজ্যের মধ্যে কালের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু প্রভুত্ব না থাকিলেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিদ্যমান আছে। প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন স্তর আছে। নিম্নবর্ত্তী স্তরে কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষিত হইলেও উর্দ্ধ স্তরে তাহা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অবশ্য অতি সূক্ষ্মভাবে তাহা থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয় ক্ষেত্রে বাহিরে কালের রাজ্য না থাকিলেও অন্তঃপ্রবিষ্টভাবে ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে কালের শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ইহা আবশ্যক। ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

কালের ধর্ম্ম জরা এবং মৃত্যু। দেহের ক্রমিক বিকার, যাহার ফলে সদ্যোজাত শিশু-দেহ বৃদ্ধ-শরীরে পরিণত হয়, উহাই জরা। কালের প্রভাব বশতঃই ইহা ঘটিয়া থাকে। কালের জগতে জরা

হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না। কালের দ্বিতীয় ধর্ম্ম মৃত্যু। কালের জগতে ইহাও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই জন্য কালের জগৎকে মরলোক অথবা মৃত্যুলোক বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং কালের রাজ্যের উর্দ্ধে কোন রাজ্য স্থাপিত হইলে তাহা হইতে কালের এই দুইটি ধর্ম্ম স্বভাবতই বর্জ্জিত হইবার কথা। ইহা ছাড়া, ক্ষুধা ও পিপাসা ইহাও কাল-রাজ্যের আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং ক্রমশঃ শুদ্ধ জগতে এই দুইটি ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া যায়। কালের রাজ্যের আর একটি আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম কাম-বৃত্তির প্রভুত্ব এবং তদাশ্রিত ও তন্মুল অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ক্রিয়া। শুদ্ধ রাজ্যে এই সম্বন্ধেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

মর্ত্ত্যলোকের উর্দ্ধে নানা প্রকার স্বর্গীয় ভুবনাবলী ও তদনুরূপ ভোগপ্রধান দিব্য স্থান আছে। এই জন্য ঐ সকল স্থানে কামের অভাব নাই এবং ভোগেরও নিবৃত্তি নাই। তবে ওখানে কালের বেগ ভূলোক হইতে অন্য প্রকার বলিয়া জরার অনুভব হয় না এবং কালে দেহের পতন ঘটে। ঐ সকল স্থান কর্ম্ম-ভূমি নহে। উহারা ভোগভূমি এবং যোগীর পক্ষে সর্ব্বথা হেয়। পূর্ব্বে যে যোগ-ক্ষেত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে উহারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং কর্ম্ম-ভূমি বলিয়া ঐ সব স্থানে ভোগের আধিপত্য নাই, যদিও কালের প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু উর্দ্ধ স্তরে তাহা হয় না। কিন্তু কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব থাকে বলিয়াই নিম্ন স্তর মৃত্যু-বর্জ্জিত হইলেও জরা-বর্জ্জিত নহে। স্বর্গাদি ভোগস্থান যেমন জরা-বর্জ্জিত হইলেও আপেক্ষিক মৃত্যু-বর্জ্জিত নহে, এইগুলি ঠিক তাহার বিপরীত— মৃত্যুবর্জ্জিত হইয়াও জরা-বর্জ্জিত নহে। উর্দ্ধ স্তরে মৃত্যুত নাই-ই,

জরাও নাই। নিম্ন স্তরে জরা থাকে বলিয়াই সেখানকার যোগী ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং জরাজীর্ণ দেহে কর্ম্ম পূর্ণ করিতে নিরন্তর উদ্যত থাকেন। এই কর্ম্মের ফলেই তাঁহারা নিম্ন স্তর হইতে ঊর্দ্ধ স্তরে উন্নীত হন। তখন তাঁহাদের স্থবির জীর্ণ দেহ কিশোর অথবা তরুণ দিব্য লাবণ্যময় শ্রী-বিগ্রহ রূপে পরিণত হয়। গুরুধাম এবং জ্ঞানগঞ্জ উভয় স্থানেই এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

—ক্রমশঃ

শ্রীশ্রী৺গুরুদেব স্মরণে

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

কোন্ সালের কথা তাহা বলিতে পারিব না, তবে ইহা যে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন একদিন বর্দ্ধমান আশ্রমে হল ঘরে শ্রীশ্রীগুরুদেব পালঙ্কের উপর নিজ আসনে বিরাজমান ছিলেন। সম্মুখে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ৺হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ৺উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৺কালাচাঁদ মজুমদার, ৺বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বসিয়া ছিলেন। আমরা কিছু দূরে বসিয়াছিলাম। প্রসঙ্গতঃ সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। তখন বাবা সামান্য এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া দুই অঙ্গুলি মধ্যে উহা ধারণ করিয়া গুলি পাকাইতে লাগিলেন, তাহার পর একটু হাওয়াতে নাড়াইয়া আমাদিগকে বলিলেন, "এই দেখ কর্পূর হইল।" তখন তাঁহার কথা শুনিয়া সভাতে উপস্থিত সকলেই উহা হইতে কিছু কিছু অংশ বাহির করিয়া মুখে দিলেন। দেখিতে পাওয়া গেল যে উৎকৃষ্ট কর্পূর রচনা হইয়াছে। বাবা ঐ কর্পূরের বাকী অংশটুকু হাতে লইয়া গুটি পাকাইতে পাকাইতে বলিলেন, "এই দেখ স্ফটিক হইল।" সকলেই উহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কেহ কেহ স্ফটিকটি

দেখিয়া বলিলেন যে স্ফটিকটি ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ছিদ্র নাই। ইহা শুনিয়া বাবা ঐটি পুনর্ব্বার হাতে লইয়া মুঠার মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে উহাকে একটি বড় আমলকীতে পরিণত করিলেন। উহা সকলেই দেখিতে পাইলেন। উহা পুনর্ব্বার দুই আঙ্গুলে ধরিয়া দুই একবার বাতাসে নাড়িয়া মুঠার মধ্যে পাকাইতেই উহা একটি মধ্যমাকারের কাঁচামিঠে আম্র ফলের আকার ধারণ করিল। ঐ আমটি কাটিয়া উপস্থিত সকলকেই একটু একটু খাইতে দেওয়া হইল। বাকীটুকু তিনি মুষ্টি মধ্যে গ্রহণ করিয়া পাকাইয়া হাওয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এই দেখ জবাফুল।" একটি রক্তবর্ণ শীষ জবা বা ওর জবা দেখিতে পাওয়া গেল। বোঁটা ধরিয়া ঐটিকে তিনি সকলকে দেখাইলেন ও বাম হস্তের তালুর বিপরীত দিকে ফুলটি নামাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ ফুলটির শীষ ও পাপ্‌ড়ি ও সর্ব্বশেষে সবুজ বোঁটাটি হাতে ঢুকিয়া গেল। উপস্থিত আমরা সকলে দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

পর বৎসর জন্মাষ্টমীর সময় বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে বাবা প্রকাশ করিলেন যে, কিছু পূর্ব্বেই তিনি বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মার পরমাণু ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কোন কোন গুরুভাই উহা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তখন বাবা বলিলেন যে একটি ছোট রূপার থালা এবং কিছু পরিমাণ গালা (চাঁচ্) সংগ্রহ করিয়া যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে রূপার থালা আনা হইল এবং গালাও আনা হইল। ইহার পর থালার উপর গালার টুকরাগুলি

রাখিয়া তাপ দ্বারা ঐগুলিকে গলাইয়া একটি গালার থালা প্রস্তুত করা হইল। ইহা সকাল বেলার কথা। বৈকালে বহু শিষ্য আসিয়া জুটিলেন। তখন বিনোদ দাদা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। বাবার আদেশ মত একটি ষ্টপার্ড শিশি যাহার মুখেও ষ্টপ্ কর্ক লাগান ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত রূপার থালাটির উপর যুক্ত গালার থালাটি আনা হইল। সকলেই বাহিরের আলোকে নিয়া থালাটি স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাওয়া গেল যে, ঐ গালার থালাটি অস্বচ্ছ। সাধারণ গালার থালা যে প্রকার হওয়ার কথা উহাও ঠিক সেইরূপই ছিল। তখন তিনি রূপার থালার উপর ঐ থালাটি রাখিয়া শিশিটির কর্ক দুইটি খুলিয়া একটি ছোট কাঠি শিশির মধ্যে ডুবাইয়া থালাটিতে ফেলিয়া দিলেন ও শিশি বন্ধ করিলেন। তখন সোঁ করিয়া একটু শব্দ হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া বাবা উপস্থিত সকলকে বলিলেন, "ঐ শব্দ শুন—পরমাণু নিজের কাজ করিতেছে।" একটু পরে যখন শব্দ বন্ধ হইল তখন গালার থালাটি হাতে তুলিয়া নিজে দেখিয়াই উহাকে আলোতে ধরিতে বলিলেন। তখন সকল শিষ্যই দেখিতে পাইলেন যে, গালার থালায় একটি উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত "ওঁ"কার চক্‌চক্ করিতেছে। বিনোদ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশিটা ত ফেটে যেতেও পারে।" উত্তরে বাবা বলিলেন, "না গো, না। সেরূপ যাহাতে না হয় এমন ভাবে রাখা হইয়াছে। কিন্তু শিশিটি খুলিয়া রাখিলে দোতালা, তেতালা ছাদ ভেদ করিয়া আকাশে মিশিয়া যাইত।"

আমরা পাড়াগাঁয়ের গরীব শিষ্য। এইজন্য বাবা আসিলেই

আমরা বর্দ্ধমান আশ্রমে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। ঐ বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন সকলেই পৌছিয়াছিলাম। বাবা বলিলেন, "আজ তিন চার দিন আহ্নিকের সময় ঘরে ভাটা-গড়ান শব্দে ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতেছে। হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম একটি গোপাল আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে ভাটা খেলিতেছে। দেখিবা মাত্র শ্রীগোপাল ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাসিয়া উঠিলেন।" এই কথা-প্রসঙ্গ উপেন দাদার সঙ্গে হইয়াছিল। বোধ হয় বেলা বারটা একটার সময় পুলিশ সাহেব ৺গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি নিখুঁত গোপাল মূর্ত্তি ও তাঁহার জন্য তাঁহার পুত্র ভুজঙ্গবাবু (সম্ভবতঃ আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) কাঠের একটি কার্পেট-পারা সিংহাসন লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বাবার আদেশে তাঁহার আহ্নিকের ঘরে সিংহাসনে শ্রীগোপালকে রাখা হইল। বৈকালে গিরীন দাদার ইচ্ছানুসারে গাড়ী করিয়া উপেন দাদা, তিনি ও আমি তিন জনে যাইয়া শ্রীগোপালের জন্য লাল পাটের ধুতি চাদর খরিদ করিয়া আনিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আনিলে ?" গিরীন দাদা বলিলেন, "ধুতি চাদর"। বাবার হাতে দিতেই বাবা বলিলেন, "চিরকালের ন্যাংটা শিশু—ওকি কাপড় পড়তে বা রাখতে পারবে ? তা হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, পরাইয়া দাও।" কাপড় পরান হইল। গলায় একটি ছোট হার (সম্ভবতঃ গিরীন দাদার স্ত্রীর দেওয়া) ও উত্তরীয় কোচ করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীবাবা একটি বড় লম্বা সাইজ আঙ্গুর হাতটিতে দিলেন। পরদিন দেখা গেল গোপাল ঘামিয়াছে,

কাপড় চাদর ভিজিয়া ঘাম গড়াইয়া সিংহাসন লাল রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন কেহ লাল কালি ঢালিয়া দিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "ঐ দেখ বাপু, ওকে কেন কষ্ট দেওয়া ? বেশ হলো, একদিন পড়ালে, এখন খুলে দেও।" বাবা গোপালের হাতে আঙ্গুর দিলেন। একটু উপরে বসে নিজের কথা বলিতে বলিতে দেখা গেল গোপাল আঙ্গুর খেয়ে শেষ করেছেন। রসের দাগ দেখাচ্ছে। এ ছাড়া কখনও কখনও গোপালের চোখে জল গড়াইত, এরূপও দেখা গিয়াছে। শেষে শ্রীপতিচরণ দত্ত দাদার বাড়ীর মেয়েরা একদিন নিজেদের প্রস্তুত ছানা, মাখন ও নানা রকম সন্দেশ মিষ্টি দিয়া ভোগ দেওয়ার পর আর চোখের জল পড়ে নাই। এই গোপাল মূর্ত্তিটি পাওয়ার ইতিহাসও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

পর বৎসর ৺জন্মাষ্টমীর সময় সর্পী ইছাপুর অঞ্চলের প্রায় সকল শিষ্যই এক সঙ্গে একই ট্রেণে বর্দ্ধমান আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমিও সঙ্গে ছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দাদা আশ্রমের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। জন্মাষ্টমীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটি অতিরিক্ত ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যা ও উৎসবের দিন দুইবেলা কার্য্য করিবার জন্য ভার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণটি উপস্থিত হইতে পারে নাই। বীরেন দাদা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ইছাপুরের দল আসিয়া পড়িয়াছে, আর কোন ভাবনা নাই।" ইহার তাৎপর্য্য এই, ইছাপুরের শিষ্যগণ প্রায়

৪

সকলেই সকল কাজেই পটু এবং কাজ করিতে পাইলে নিজেকে ধন্য বোধ করে। এই কথা বাবাকে শুনাইয়া বলা হইল। যথা-সময়ে যথাবিধি কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিদায় কালে সাড়ে তিনটার ট্রেণের সময় হইবার পূর্ব্বেই পূজনীয় ৺রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী দাদা মহাশয় বিদায় লইয়া আসিলেন। তিনি আমার হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তাহার পর আমিও বিদায় লইলাম। দুইজনে এক সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ষ্টেশনে যাওয়ার পথে ফুট-বলের মাঠটি পার হওয়ার সময় সঙ্কল্প করিলাম যে ঐ দিন হইতে আমরা ভোর তিনটায় আহ্নিকে বসিব এবং ছয়টায় উঠিব। আমার ভিতর ঐ সঙ্কল্প খুব প্রবল ভাবে উঠিয়াছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে আমি ঐ দিন হইতে ভোর আড়াইটাতে উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া ঠিক তিনটার সময় বসিতে লাগিলাম। তিন ঘণ্টা আহ্নিক করিয়া প্রতিদিন ভোর ছয়টায় উঠিতে লাগিলাম। এই প্রসঙ্গে বাবার একটি কথা মনে পরিতেছে। তিনি বলিতেন, "বাপুরে, আগুনকে বাবা বলিলেই বা কি, শালা বলিলেই বা কি, সে নিশ্চয়ই পোড়াইবে। তুমি যেমন ভাবেই জপ কর কাজ কিছু হইবেই।" সেই সময় অবশ্য শিশু শ্রেণীতে ছিলাম, তাই তখনকার কথা নাই বা বলিলাম। কিন্তু এখনও দেখি সব সময়ে মন স্থির থাকে না—জপ অবশ্যই চলে, তদনুসারে আঙ্গুলও চলিতে থাকে, কিন্তু মন অন্য কোন চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। বিষয়ান্তর হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার যথাস্থানে লাগাইতে হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আবার চলিয়া যায়। এইরূপই সাধারণতঃ হইয়া থাকে।—এই প্রকার নিজের মনের

অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া কাশীতে থাকার সময় একদিন শ্রীগুরুদেবকে বলিয়াছিলাম, "বাবা, চাকর বাউলের একটা গানের কথা সর্ব্বদাই মনে হয়। গানটি এই—

যা হবার নয় তাই মনে হয় ঘুরে ফিরে,
সে কি সাধারণ বস্তু যে মিলবে তোরে—
বনের টিয়া চন্দনা ফেলি
আন্‌লাম কোচ বগলি,
মনে করলাম রাধাকৃষ্ণ বল্‌লেও বল্‌তে পারে।
কিন্তু এমনি পাখী নষ্ট কত দেয় কষ্ট,
কয় না রাধাকৃষ্ণ শুধু কোক্ কোক্ করে।
যদি সুজাত পক্ষী হতো
শিখালেও শিখিত বলালেও বলিত 'হরে কৃষ্ণ হরে'॥

বাবা, সুজাত পক্ষী নই, কি করে হবে? ভরসা আপনার কৃপা মাত্র।"

এইভাবে তিন দিন ঠিক তিনটায় বসিয়া সকাল ছয়টায় আহ্নিক শেষ হইল। চতুর্থ দিন ভোরে শৌচাদির জন্য মাঠে গিয়াছিলাম। একটা পাগলা শেয়াল হঠাৎ চুপি চুপি আসিয়া কামড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বাতি হাতে করিয়া পেছনের দিকে তাকাইয়া দেখি একটা শেয়াল, গায়ে একেবারে লোম নাই। দেখিয়া পুকুরে যাইয়া ক্ষত স্থান জল দিয়া ধুইলাম ও বাড়ী ফিরিয়া কার্ব্বলিক এসিড্ দিয়া পোড়াইলাম। তারপর আহ্নিক করিতে বসিলাম। আহ্নিক হইতে উঠিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে খামে সব লিখিয়া জানাইলাম। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলাম

কমলপুর গ্রামের অঞ্চলে পাগ্‌লা কুকুরের দংশনে তুইটি লোক মারা গিয়াছে। মনটা চঞ্চল হইল। দশ বার দিন পর সর্পীর জগদানন্দ গোস্বামী দাদাকে বাবা একটি ঔষধের গাছের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যেন উহা তুলিয়া আমাকে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত আমাকে কিছু বেশী পরিমাণে ঘি খাইতেও আদেশ করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "এই গাছ যদি পাওয়া যায় তবে বিধি-লিপিরও খণ্ডন হইবে। ইহা শিখিয়া রাখ। ইহা দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার করিতে পারিবে।" জগদানন্দ দাদা এখন পরলোকে। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ গুরুগতি গোস্বামী বাবার দেহে অবস্থান কালেই তাঁহারই আদেশানুসারে ৺তুর্গাদাদার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বাবার নিকট গিয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "আজই জগদানন্দকে ঔষধ দিয়া পাঠাইয়াছি। কোন চিন্তা নাই। ঘরে বা গ্রামে যদি কাহারও সুলতানী বনাত থাকে এক আনা ওজন ঘৃতের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিতে পার। কিছুদিন ঘৃত খাওয়াইবে।" আমি তাহাতেই ভাল হইলাম। আবার তুই এক বৎসর পরে তুইটি কুকুর ঝগড়া করিতে করিতে আমার পায়ে কামড়াইয়া দিল, তখনও সেই ঔষধের দ্বারাই আরোগ্য লাভ করি। ইহার পর ধানবাদে যখন বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম তখন বাবা বলিলেন, "কুকুরটা মারা যাবে।" বাড়ী ফিরিয়া সংবাদ লইলাম, জানিতে পারিলাম যে কুকুরটি রক্ত দাস্ত করিতেছে। উহার তিন চার দিন পরেই উহা মারা গেল।

সন ১৩৩০ সালে আমার বাড়ীতে আমার ও আমার স্ত্রীর

অনুপস্থিতি কালে রাত্রে চুরি হয়। তাহাতে আমার মেজ কন্যার সমস্ত অলঙ্কার, বড় ছেলে মদনের শ্বশুরের দেওয়া চেন্ এবং আমার স্ত্রী ও অন্যান্যদের যাহা কিছু ছিল সব চুরি হয়। ইহা ছাড়া একটি বাক্সে ভাল ভাল কাপড়-জামা থাকিত তাহা, ৺দুর্গাদেবীর বিজয়া দশমীর যাত্রার টাকা চব্বিশটি এবং একটি বড় ঘড়া চুরি হয়। শ্রীশ্রীবাবাকে আমি এই সংবাদ জানাইয়া প্রার্থনা করি যে, আমাদের নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা যাওয়ার জন্য তত দুঃখ নাই, কিন্তু কন্যার অলঙ্কার চুরি হওয়াতে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, কারণ উহা পুনর্ব্বার দিবার ক্ষমতা আমার নাই। এই অলঙ্কারের জন্য আমাকে সমস্ত জীবন গঞ্জনা লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিতে হইবে। এই পত্রের উত্তরে বাবা লিখিলেন, "চিন্তার কোন কারণ দেখি না। উপদেশ মত কর্ম্ম ঠিক ভাবে করিবার চেষ্টা করিলে সকল বিষয় আনন্দ পাইবেই পাইবে।" শ্রীশ্রীবাবার চিঠির কথা সকলেই জানিতে পারিলেন। এদিকে পুলিশেরও ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া হইয়া গেল। যে চুরি করিয়া ঐ সকল দ্রব্য আত্মীয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রি দশটার সময় সেই আত্মীয়ের একটি মাত্র পুত্রের হাতে কিসে যেন কামড়াইল বলিয়া মনে হইল। দেখিতে দেখিতে হাত প্রবল ভাবে ফুলিয়া গেল, কাঁধ পর্য্যন্ত ফুলিয়া গেল এবং ছেলেটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া স্বামী বলিয়া উঠিল—"পরের জন্য নিজের একটি মাত্র পুত্র হারাইলি। শুনিয়াছি মুনীন্দ্রের গুরুদেব স্বয়ং শিব মহাযোগী।" এই কথা

বলিতে বলিতেই স্ত্রী অলঙ্কারগুলি স্বামীর হাতে দিয়া কাতরভাবে বলিল "এই নাও, ফিরাইয়া দেও, যেন ছেলেটি ভাল হয় আর আমাদের কোন বিপদ না হয়।" অলঙ্কারগুলি ফিরাইবার জন্য আমার কোন আত্মীয়ের হাতে দিবার পর দেখা গেল ছেলের যন্ত্রণা নাই এবং হাতের ফুলাও ধীরে ধীরে সব নিশ্চিহ্ন হইল। ইহার পরে স্বামী বলিল "দেখলি ত কেমন তাঁর খেলা। তিনি যে ভগবান্ তা বুঝলি ত?"

সন ১৩৩১ সালের প্রায় অধিকাংশ দিনই প্রত্যহ অণ্ডালে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে থাকিয়া সকাল বেলা অণ্ডালের রোগীদিগকে ঔষধাদি দিয়া বেলা দশটার সময় আহারাদি শেষে ইছাপুর সর্পী প্রভৃতি অঞ্চলের রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসা প্রায় নিত্য নিয়মিত কার্য্য ছিল। একদিন গরমের সময় বাড়ী ফিরিতে আমার একটু বিলম্ব হয়। রাস্তায় একটি পুকুরের পারের নীচের পথে দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে মনে হইল যেন কাঁটা ফোড়া গেল ও একটি সর্প লাফাইয়া পালাইল। তখন মনে হইল সাপটা বোধ হয় পায়ের নীচে দাবা পড়িয়াছিল। বাক্স বহনকারিণী বলিল, "কাকাগো, জাত সাপ তুধে খরিস্।" জ্বালা করিতেছিল। বাক্সে আইয়োডিন্ ছিল, বেশ করিয়া লাগাইয়া দিলাম। কামিন্‌টি বলিতে লাগিল, "ফিরিয়া চলুন গোষ্ঠ কাকার কাছে।" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী সাং ইছাপুর আমাদের গুরুভাই, উৎকৃষ্ট সাপের ওঝা। তাহাকে বলিলাম, "না, ঘরেও বলিও না।" শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে জ্বালা সত্ত্বেও দ্রুত পা উঠাইয়া বাড়ী

পৌঁছিলাম। কিন্তু মেয়েটি আমার স্ত্রীকে বলিয়া দেয়। গ্রামের দুইজন ওঝা আমার নিকট আসিতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাই, কি দরকার?" তাঁরা বল্‌লেন, "তুমিই ত ডেকেছ।" আমি বুঝিলাম এবং পাটি দেখাইলাম ও বলিলাম, একদিকে একটি দাঁত একটু প্রবেশ করিয়াছিল, অন্য দিকে উপরের প্রথম স্থান হইতে দ্বিতীয় স্থান পর্য্যন্ত আঁচর। চুল দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল দাঁত নাই, জ্বালা অবশ্য আছে। "ঔষধ দিব, লোক পাঠাইয়া দাও" ইহা বলায় বলিলাম, "না, ঔষধ খাইব না।" এই সময় আমার ছোট ছেলে শ্রীমান্ গুরুপদ বলিল— "শ্রীশ্রীগুরুদেবের ঔষধ একটি গাছ, পটু দাদাকে দিয়াছিলেন, একটি ঘরে রাখিয়াছেন। সেইটি বেঁটে দিই।" সেই ঔষধ 'জয়গুরু' বলিয়া খাইয়া ফেলিলাম। ওঝারা বলিয়া গিয়াছিল যেন খাইতে ও ঘুমাইতে দেওয়া না হয়। আমি চা খাইয়া আহ্নিক করিতে বসিলাম। নিয়মিত সময়ের মধ্যেই আমার জ্বালা-নিবৃত্তি হইল। ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু ওঝার উপদেশে উহারা খাইতে দিতে চায় না। শেষে দুধ, মুড়ি খাইলাম। মাটির কোঠার উপর গিয়া শুইলাম। এদিকে নীচ হইতে মা ও মেয়েরা সতর্ক করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ঘুমুলেন নাকি?" একটু নিস্তব্ধ ভাব হইতেই পুনর্ব্বার ঘুমের আবেশ আসিতে লাগিল। উত্তর দিকের জানালা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। নীচ হইতে বলা হইল, "উত্তর দিকের জানালা খুলিলে কি?" ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া দেখিতে পাইলাম যেন কত সার্চ্চ-লাইটে ভরা উজ্জ্বল আলোক, সঙ্গে সঙ্গে ভুর ভুর করিয়া শ্রীশ্রীবাবার অঙ্গ-সৌরভ। তখনই একটু স্বস্থ হইয়া

স্ত্রী ও মেয়েকে দেখিতে ডাকিলাম। তাহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, আনন্দে বলিয়া উঠিল, "এবার নিশ্চিন্তে ঘুমান, যখন শ্রীশ্রীবাবা এসেছেন তখন আর ভয় কি? ভাবনাই বা কি?" শ্রীশ্রীবাবার এই কৃপা আমরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

একবার বর্দ্ধমান আশ্রমে আমি ৺জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এক ঝাঁকা সর্পীর কচু, কিছু ঝিঙ্গা, ধুন্ধুল ও থাঁড়া লইয়া গিয়াছিলাম। বীরেন দাদা উহা যথাবিধি ভাণ্ডারে রাখিয়া দিলেন। কলিকাতা হইতে অনেক গুরুভাই কলা, কমলানেবু, আপেল, বেদানা ইত্যাদি আনিয়া বীরেন দাদাকে দেন। দেখিয়া আমার মনে একটু ক্ষোভ জন্মিল। মনে হইল সকলে ভাল ভাল ফল আনিতেছেন আর আমি আনিলাম শুধু কচু! বৈকাল বেলা পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক কিছু আনিলেন। প্রত্যেক বারই আমার দুঃখ একটু করিয়া চাড়া দিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীবাবা সন্ধ্যার পূর্ব্বে উপরে উঠিয়া যাওয়ার সময় হঠাৎ ভাণ্ডারের কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া থলে ও ঝাঁকা প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টাতে কি আছে একটি একটি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী আমার মনের ক্ষোভ দূর করার জন্য "দেখি কি আছে" বলিয়া ঝিঙ্গে ধুন্ধুল ও থাঁড়ার পরে কচু দেখিয়া বলিলেন, "মুনীন্দ্র এনেছে বুঝি? এই কচু ভাল, আমার মা খুব ভাল বাসেন। এখানকার জন্য রেখে কাল কিছু পাঠাইয়া দিও।" আমার আর বলিবার কি আছে? ক্ষোভ অবশ্য গেল। মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "ঠাকুর, তোমার খেলা বুঝে কে?"

সেই সময় শ্রীশ্রীবাবার নিকটেই আছি। কেহ বলিতেন চাক্‌রী করিতেছি, আবার কেহ কেহ বলিতেন খুব অভাবের জন্য চাক্‌রীর নাম করিয়া বাবা নিকটে রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, বাবা আমার মৃত্যুযোগ লক্ষ্য করিয়া আমাকে নিজের নিকট হইতে দূরে যাইতে দিতেছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার আর ফিরে যাওয়া চল্‌বে না, তোমার মৃত্যুযোগ রয়েছে। আমি পিতা বর্ত্তমানে ছেলেকে কালের কবলে ঠেলে ফেলে দিতে পারব না। বৌমা, ছেলে প্রভৃতিকে ব'লো এইখানে তোমার চাক্‌রী হইয়াছে। পঁচিশ টাকা বেতন, দুইবেলা আশ্রমে আস্‌তে পারবে; বুঝাইয়া বলিলেই সকলে রাজী হইবে।" বাৎসরিক তিনশত টাকার অনেক অধিক বাবা দিতেন। বাড়ী পাঠাইবার টাকা বাবাই দিতেন। মদন ও আমার বড় বৌমা উভয়েই শিষ্য, তাহাদের কষ্ট বুঝিলেই বাবা চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা দিতেন। বলিতেন, "পাঠাইয়া দাও।" ইহা ছাড়া কাপড়, জামা, সুয়েটার, কম্বল, মশারী ইত্যাদির তো কথাই ছিল না। বিনা অনুমতিতে আশ্রমের বাহিরে যাওয়ার নিষেধ ছিল। প্রথমে রাসবিহারী দাদার সহকারী ছিলাম, পরে রাসবিহারী দাদাকে তীর্থ-ভ্রমণের জন্য দুইশত টাকা দিলেন, সেই সময়ে বাবার সেবার ভার আমারই উপর ন্যস্ত হইল। রাসবিহারী দাদা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে বগুল আশ্রমে স্থান দিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে সেইখানেই ছিল। শ্রীশ্রীবাবার এই সকল কৌশল পরে বুঝিয়াছিলাম। এই সময়ে নানা প্রকারে আমাকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার আস্‌বার পত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ভার

আমাকে দিয়াছিলেন। শিষ্যেরা, বিশেষতঃ কটক অঞ্চলের শিষ্যেরা, গঞ্জাম সিল্কের ধুতি দিয়া প্রণাম করিলে ঐ সকল ধুতি কুমারীর জন্য পার দিয়া যোগিয়া রঙ্গে রঞ্জিত করিবার জন্য ৺রমেশ মৈত্র দাদার হাতে দিতেন। তিনি ঐগুলি রঙ্গ করাইয়া আনিয়া যথাসময়ে বাবাকে ফেরত দিতেন। আমার নিকট ঐগুলি গচ্ছিত থাকিত। এইভাবে বার খানি কাপড়ের পার ও রঙ্গ দেওয়া সম্পন্ন হইলে আমি বাবাকে ঐ বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতাম। তখন বাবা আমাকে আদেশ করিতেন, "ঐগুলি সাড়ীর বাক্সে ভাল করিয়া প্যাক কর, ডি. এম. সি. সুতা দ্বারা বাঁধ ও দুই তিনটি শীল কর।" তিনি শীল-মোহর দিতেন। আমি শীল করিয়া তাঁহার হাতে দিতাম। চারিদিকের শীলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন ও বলিতেন—"কুমারী-মাতাদের জন্য এগুলি পাঠাইয়া দেওয়া যাক্।" এই বলিয়া বাক্স দেওয়ালের দিকে ছুড়িয়া দিতেন—সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটি অদৃশ্য হইত। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই বাক্স ও সেই সুতা কেবল "জ্ঞানগঞ্জ স্বামীজীর আশ্রম" এই প্রকার শীলযুক্ত হইয়া তেতালা ও দোতালার ছাদ ভেদ করিয়া শ্রীশ্রীবাবার আহ্নিকের ঘরে সুগন্ধযুক্ত ভাবে পড়িত। এই সকল অলৌকিক ব্যাপার আমি বহু ভাগ্যবশে দেখিবার অবসর পাইয়াছি।

কাশী রামনগরের তদানীন্তন চীফ জজ সাহেবের ছেলে শ্রীযুক্ত সুরজপ্রকাশ মুশরাণী এম-এ, আমাদের গুরুভাই ছিলেন। তাঁর খুব অসুখ, তিন দিন অজ্ঞান। ডাক্তারবাবুরা আশা কম বলিয়া মত প্রকাশ করায় জজ-সাহেব বাবাকে এ সংবাদ দিয়া বলিলেন

"বাবা, আপনার শরীর ভাল নাই। তাই বলতে পারছি না। একবার চরণধূলি দিয়া আসুন।" বাবা বল্লেন, "আচ্ছা, দেখা যাক্।" বাবা সেই রাত্রেই সূক্ষ্ম শরীরে সেখানে যান এবং সুরজপ্রকাশ দাদা "শ্রীশ্রীগুরুদেব এসেছেন"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার পিতা ও অন্যান্য সকলে শ্রীগুরুদেবের গাত্র-সৌরভ অনুভব করিলেন। সূরজপ্রকাশের জ্ঞান সঞ্চার হইল এবং সে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে পথ্য করিল। ইহার ফলে জজসাহেব তাঁহার বন্ধুসহ পাঁচশত টাকা একটি খামের মধ্যে মুড়িয়া শ্রীশ্রীবাবার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই টাকা জ্ঞানগঞ্জের কুমারী-মা'দের ভোজনের জন্য দিলাম।" বাবা খাম খুলিয়া দেখিলেন, পাঁচখানি একশত টাকার নোট। তখন অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। বাবা বলিলেন, "পাঁচশত টাকা?" উত্তর—"হাঁ বাবা।" ইজি চেয়ারের হাতলের উপর টাকা সহ খামটি রাখিয়া দুইটি বড় ও একটি ছোট চাপড় দিয়া বলিলেন—"পাঠাইয়া দিতেছি।" সঙ্গে সঙ্গে খাম অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে খামটি ছাদ ভেদ করিয়া সুগন্ধ বিছাইয়া পড়িল। বাবা দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ গো তোমার সেই খামটি ফিরিয়া আসিল, এটি ঘরে লইয়া যাও।"

একবার ৺শিবরাত্রি পর রাত্রি সাড়ে দশটার সময় কাশী আশ্রমে তেতালার বারাণ্ডায় রোহিণীকুমার চেল দাদা দাঁড়াইয়া আছেন—আমি ভিতরে শুইয়া। শ্রীশ্রীবাবা নিজ ঘর হইতে আকাশ-মার্গে যাইতেছেন, রোহিণী দাদা দেখিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীবাবা আকাশ-মার্গে যাইতেছেন।" তাড়াতাড়ি বাহিরে

গিয়া দেখি একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলা উর্দ্ধে উঠিয়া উঠিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। রোহিণী দাদা বলিলেন "প্রথমে চিনিতে পারা গিয়াছিল।"

আমি তখন কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার নিকটে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে প্রত্যেক জিনিষই যে সছিদ্র সেই কথা হইতেছিল। দশ বার জন গুরুভাইও সেখানে ছিলেন। কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কাঠটি ?" (শ্রীশ্রীবাবার ছপ্পর খাটের কাঠ দেখাইয়া) উত্তরে বাবা বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" বলিয়া বিছানা সরাইয়া আঙ্গুল দ্বারা ঘসিয়া দিয়া বলিলেন, "ঐখানে একটি ধাতুর টাকা রাখ।" রাখা হইল, সেটি মিশিয়া গেল। এইভাবে এক একটি করিয়া ক্রমে দশটি টাকা রাখা হইল। দশটি টাকাই ঢুকিয়া গেল এবং উপরে কাঠের আবরণ পড়িল। এক ভাই বলিলেন,—"উহা পাওয়া যাইতে পারে ?" উত্তরে—"হাঁ নিশ্চয়ই, কুমারী-ভোজন করাও।" বলা মাত্র সকলেই চুপ। পুনঃ বাবা বলিলেন, "আমিই কুমারী-ভোজনের ব্যবস্থা করিব।" বলিয়াই সেই জায়গাটি পুনঃ আঙ্গুল দিয়া ঘসিয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে কাঠের উপরে টাকা দশটিই ক্রমশঃ উঠিয়া আসিল। বাবা বলিলেন, "যার যেটি তুলিয়া লও।" সকলেই তুলিয়া লইলেন।

বর্দ্ধমান আশ্রমে আছি। উখরার হেড পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর গোস্বামী আমার বন্ধু। তিনি শ্রীশ্রীবাবার দর্শন প্রার্থনা করিলেন। আমি বাবাকে জানাইবা মাত্র উপরে লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। তিনি বাবার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তার পর বিদায় লইয়া গেলে বাবা বলিলেন,

"ছেলেটি বেশ ছেলে।" নীচে নেমে এসে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাবেন?" তিনি বলিলেন, "শ্রীগুরুদেবের নিকট।" তিনি বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্তা শক্তিবিবির বাড়ীতে থাকেন। আমিও বাবার নিকট যাইবার অনুমতি চাহিলে বাবা বলিলেন, "হাঁ যাও, দেখে এসো। মেয়েটি খুব ভাল মেয়ে।" সঙ্গে যাইয়া বন্ধুর গুরুদেব শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংসকে (শ্রীশ্রীমায়ীজী) দর্শন ও প্রণাম করিয়া ফিরিলাম। পরদিন সকালে পূজনীয় দুর্গাদাদার বন্ধু-ভাবাপন্ন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রকাশ কর্পূর আমার বন্ধুটি সহ আসিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদাকে শ্রীশ্রীবাবার দর্শন প্রার্থনা করিয়া জানাইলে বাবা উত্তরে বলিলেন, "চল, নীচে যাইতেছি।" প্রণামের পর উভয়েই বলিলেন—"সূর্য্য-বিজ্ঞানে সৃষ্টি দেখিবার জন্য এসেছি—দয়া করে দেখান।" উত্তরে—"সিল্কের রুমাল এনেছ কি?" উত্তরে—"হাঁ বাবা, নূতন একটি ও ধোয়া একটি এনেছি।" উত্তরে—"যে কোনটি হইলেই চলিবে।" বলিয়া দোক্তার কৌটাটি হইতে দোক্তা ঢালিয়া দিয়া দেবীবাবুকে উহা জলে ধুইয়া পরে গঙ্গাজলে ধুইতে বলিলেন। পূজনীয় দাদা গঙ্গাজল আনিয়া দিলেন। পরে সিল্কের রুমালটি দিয়া ঢাকনি সহ কৌটাটিকে ঢাকিয়া শ্রীশ্রীবাবা দেবীবাবুর হাতে দিয়া লেন্স দিয়া ফোকাস্ করিয়া (রশ্মিপাত) দিলেন—দুইবার দেওয়ার পর ভারী লাগে নাই। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে—"কই বাবা বুঝছি না।" পরে বলিলেন, "হাঁ, ঠিক হয়েছে।" কৌটা খুলিয়া দেখা হইল, দেওঘরের পেড়ার পাক সন্দেশ। সকলে সামান্য সামান্য খাইলেন। দেবীবাবু বাকীটুকু বাড়ী লইয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদাও যে শক্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ আমার নিকট তিন চারি বার প্রকাশ পাইয়াছিল। তারই মধ্যে একটি না দিয়া শান্তি পাইতেছি না।

তখন আমি ইছাপুর গ্রামে, ইহা অণ্ডাল হইতে চার পাঁচ মাইল দূর, মধ্যে একটা জোড় 'তামলার জোড়' নামে খ্যাত। শ্রাবণ মাস—একাদিক্রমে এগার দিন মুষলধারে বৃষ্টি, বিরাম নাই। আমার বড় ছেলে মদনও শ্রীশ্রীবাবার শিষ্য। নয় দিন জ্বর, ছাড়ে নাই—কোনও লোক দ্বারা সংবাদ দিতেও পারে নাই। আমার সম্পর্কীয় ভাগিনেয়ের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের তামলা ব্রীজে পার হইয়া বেনাচিতি ভিড়েঙ্গী ঘুরিয়া এগার বারো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমার নিকট পাঠাইল। সেই সবে মাত্র চার পাঁচ মাস নিশ্চিন্ত দিন কাটাইবার পর দশ পাঁচটি ডাক পাইতেছি। এমন সময় এই সংবাদ। পরদিনের ধারটা পর্য্যন্ত সব রোগীদের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আহারাদির পর বাহির হইলাম। উভয়ে সাঁতার দিতে জানিতাম এবং জোড়ের বানের বেশ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া উভয়েই গামছা পরিয়া ইন্‌জেক্‌সনের ছোট বাক্সটি কাপড়-জামাসহ পোঁটলা করিয়া লইলাম। ভীষণ বান। "জয়গুরু" বলিয়া নামিয়া যেটুকু প্রকৃত স্রোত তাহা সাঁতার দিয়া—অবশ্য ঔষধ ইন্‌জেক্‌সনাদি মাথায় পাগড়ী দ্বারা আটকাইয়া—পার হইলাম, এবং এক মাইল এক কোমর জলে জলে আসিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে উঠিয়া কাপড় পরিয়া ভদ্রবেশে উভয়েই বাড়ী পঁহুছিলাম। বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষার পর বুঝিলাম টাইফয়েড

ফিবার। কাহাকেও না ডাকিয়া নিজেই "জয়গুরু" বলিয়া চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলাম। পরদিন সকালে ঔষধ দিয়া আহারাদির পর ইছাপুর ফিরিলাম। এইভাবে রোজ চলিতে লাগিল। কুড়ি দিনের রাত্রে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া রাত্রি দেড়টার সময় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিল। রাত্রি আড়াইটার সময় শ্রীশ্রীদাদা আমার শিয়রে আহ্নিকের আসনের উপরে কাপড়টিতে বসিয়া আমার বাম বাহুতে জোরে টিপিয়া মনীদা মনীদা বলিয়া ডাকিলেন। টিপুনীর বেদনায় উঠিয়াই দেখি, দাদা বসিয়া আছেন—কামিজের উপর কোট একটি, বুক পকেটে "রাজা" কলমটি। অমনি প্রণাম করিলাম, পদস্পর্শ করিলাম। শ্রীশ্রীদাদা বলিলেন, "কি মনীদা, তুমি না ডাক্তার? এত কাতর হয়েছ?"

আমি—কি বলেন দাদা, চার পাঁচ মাস ত এক প্রকার বসেই। এই বিরাট সংসার, সবে মাত্র ডাক আরম্ভ হয়েছে, ছেলের হলো টাইফয়েড, কোন দিক্ রাখি।

শ্রীদাদা— ভাবিস্ না, আমি পশ্চিমে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

বলিয়া পকেট হইতে কলম ও পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া লিখিলেন এবং বলিলেন, "আমিই ডাকে ফেলিয়া দিব।"

আমি—সে ত হলো দাদা, এইভাবে আর কদিন আনাগোনা করতে পারি? তার উপর রাত্রি জাগরণ।

শ্রীদাদা—আজই জ্বর ছেড়ে যাবে। তবে তুই চার দিন যাবে আসবে। সেরে যাবে, চিন্তা করো না।

আমি—তাই হোক্—আপনার ইচ্ছায় যা মঙ্গল আছে।

শ্রীদাদা—তবে আসি, ভেবো না আজই জ্বর ছাড়বে। আমি প্রণাম করিলাম। শ্রীদাদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আমি পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে ঘড়ি দেখিয়া ঘুমাইলাম। সকাল ছয়টায় উঠিয়াই মদনকে দেখিলাম, থার্ম্মোমিটার দিলাম। একি ! দেখি একশত আড়াই, অন্য দিন থাকে একশত দেড় ডিগ্রি। পুকুরের দিকে ভাবতে ভাবতে গেলাম—একি স্বপ্ন দেখলাম ? যদি তাই হয় বাহুতে টিপুনীর বেদনা এখনও কেন রয়েছে—যাক্, শৌচাদির পরে আসিয়া আহ্নিক করিতে বসিলাম, কিন্তু আহ্নিক ঠিক হইল না—স্বপ্ন না সত্য ইহাই বিচার চলিল। জপও চলে, আঙ্গুলও চলে। আন্দাজ সাতটা পনের মিনিটে উঠিয়া পুনরায় আসিয়া থার্ম্মেমিটার দিলাম, দেখিলাম সাড়ে নিরানব্বই। মদন বলিল, "বেশ ঘাম হইতেছে।" বসিয়া চা খাওয়ার পর দেখি সাড়ে সাতানব্বই। জামা, কাপড়, বিছানা নূতন দিলাম। আনন্দে মদনের কাছে রাত্রে শ্রীদাদার আগমন ও কথাবার্ত্তা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল, "তবে আপনি ঔষধ দিয়া চলিয়া যান, দুই তিন দিন আসিবার দরকার নাই।" চব্বিশ দিনে জ্বর আর আসে নাই, অবশ্য আরও দুইদিন আসিতে হয়েছিল মনের দুর্ব্বলতায়। এরূপ দুর্দ্দিনে দাদা আমাকে মাঝে মাঝে বল দিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা বর্দ্ধমানে থাকাকালীন আমার ছোট ছেলে দীক্ষা প্রার্থনা করায় শ্রীদাদা তাহাকে দীক্ষা দেন, অবশ্য বাবার ইচ্ছানুসারে। আমিও বাবার মুখে শুনিয়াছি দুর্গাদাদা বেশ খাটিতেন এবং দাদাও বলতেন "বাবাও আস্তে আস্তে আমাকে যা দিবার দিতেছেন।" ইহাও শ্রীগুরুস্মৃতি – "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু"—বচন না মানিয়া পারি না।

দিব্য-পুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ

শ্রীসুবোধচন্দ্র রক্ষিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

"* * * বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া না পড়িয়া সর্ব্বদাই মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও—তাহা হইলেই সব হইবে * *"

—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ

সুখ, দুঃখ ও অভাব—ইহা লইয়াই ত' মনুষ্য-জীবন। প্রকৃত পক্ষে, মানব-জীবন দুঃখেরই সমষ্টি। "Life is a sentence of sorrow, with punctuations of happiness." কিন্তু এই মানব-জীবনে কেন এত দুঃখ? এই দুঃখকে কেমন করিয়া তিরোভূত করা যায়? এই চিরন্তনী সমস্যার মীমাংসা এখনও হয় নাই; তবে বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতবাদ এই বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেরই একমত যে, যতক্ষণ শরীর আছে, দুঃখ অবশ্যই থাকিবে। শরীরই দুঃখের কারণ; অতএব, দুঃখের প্রকৃত অবসান সাধন করিতে হইলে, উহার কারণ শরীর-ধারণ বা পুনর্জ্জন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-সাধন অগ্রে প্রয়োজন। প্রবৃত্তিই (আসক্তি) জন্মের হেতু, সুতরাং প্রবৃত্তি নাশেই জন্ম-নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। জীবের ভোগ-বাসনাই বন্ধন ও দুঃখের

কারণ, এবং উহার বিনাশ-সাধনই মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ। শরীর ত' একদিন নষ্ট হইয়াই যাইবে; তবে, এই বন্ধন ও মোক্ষ শরীরের না মনের? সূক্ষ্মদেহই মনের আধার, কিন্তু মনের কার্য্যের (function) প্রকাশ হয় স্থূলদেহে। দেহের সহিত তাহার ছায়া যেরূপ সদাই যুক্ত থাকে, মনের সহিত অভাব-বোধ ও বিষয়াসক্তি সেইরূপ নিয়তই বিদ্যমান। সেইজন্য মনই মানবগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ; মনই আমাদের পরম শত্রু বা মিত্র।

"মনঃ করোতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনো ভূত্বা ন পুণ্যৈঃ ন চ পাতকৈঃ।"

জলের ন্যায় মনের স্বাভাবিক নিম্নগতির (বৃত্তি) কারণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবা বলেন—"* * * জীবের নীচ-ভাব সকল মাধ্যাকর্ষণ হইতে ফুটিয়া উঠে। স্থূল বায়ু-মণ্ডল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, পার্থিব বাসনা ও কামনাদির ছায়া ঘিরিয়া রহিয়াছে। মৃত্যুর পরেও জীব এই সকল বাসনাতে জড়িত থাকে বলিয়া, মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থূল-বায়ুর সীমা লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মল নভোরাজ্যে বিচরণ করিবার সামর্থ্য না হইলে, মৃত্যুকে জয় করিয়া জন্মের অতীত শুদ্ধ-দশা প্রাপ্ত হইবার আশা নাই।"

বিষয়-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ সুখের প্রার্থনা মানব-জীবনের দুঃখের একটি কারণ। এইজন্য সুখ-কামী ব্যক্তি চির-দুঃখী। মনের নিগ্রহ বা দমনের দ্বারাই বন্ধন-মুক্তি সম্ভব

হয়। যোগ-সাধনই ইহার একমাত্র উপায়। শ্রীশ্রীবাবার কথায় ইহা "আত্ম-শোধন বা উপাদান-শুদ্ধি। এই আত্ম-শোধনের একমাত্র উপায় 'যোগ'। যোগ ভিন্ন কোন উপায়েই চিত্ত ও দেহের বিশুদ্ধি সম্পন্ন হয় না। লিঙ্গের (মনঃ বা বাসনাযুক্ত মনঃ) সহিত শুদ্ধ-আত্মা বা সূক্ষ্ম-তত্ত্বের (চৈতন্য, আত্মা বা পরমাত্মা) সংঘর্ষই 'যোগ'। স্থূলের সহিত লিঙ্গের তীব্র সংঘর্ষ না হইলে, উহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, আর উহা প্রজ্বলিত না হইলে স্থূলের নিবৃত্তি হয় না।" আসক্তি নাশ না হইলে, বনে গিয়া বাস করিলেও দোষ উৎপন্ন হয়। বাবার যোগ-প্রক্রিয়ার সহিত সাধারণ প্রচলিত পন্থার বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান। মনুষ্য-জীবনে সকল উপায়ের মধ্যে যোগ-মার্গকেই বাবা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। এই জগতে যে যাহা চায়, সে তাহার বেশী প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু, যিনি কোনও বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না (নিরাসক্ত) তিনি প্রাপ্তব্য বস্তু পাইয়াই থাকেন, এবং সর্ব্বশেষে সত্য ও পরমানন্দ স্বরূপ পরম বস্তুরও আস্বাদন লাভ করেন। ইহাই যোগি-জীবনের একটি রহস্যময় ব্যাপার!

দিব্য-পুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের আবির্ভাব আমাদিগকে দিব্য-জীবন ও জন্ম-নিবৃত্তির যথার্থ পথ দেখাইয়া দিবার জন্য! অতি সুস্পষ্টভাবেই তিনি ঐ মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেবও তাঁহার এক পত্রে শ্রীশ্রীবাবাকে লিখিয়াছিলেন—"* * * সংসারে সব আশ্চর্য্য। শান্তি কেউ চায় না। আমার উদ্দেশ্য মহাপাতকদিগকে উদ্ধার

করিব ; তাতেই পাপীদিগকে স্বর্গ-সুখ দিবার জন্য তোমায় শিষ্য করিতে বলা। করি এক, সবে করে এক।" আমাদের মধ্যে তিনি যে ধারা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন উহা যেন উপযুক্ত আধারের অভাবে প্রতিহত না হয়। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না। বাবা বলেন—"* * * তীব্র পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্মও খণ্ডন করা যায়; বিধির বিধান উল্টান যায়। তবে, 'পুরুষকার' ও 'কৃপা' পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শুধু কৃপা হইলেই ত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, যদি না তাহার সহিত পুরুষকারের যোগ থাকে। তীব্র পুরুষকার থাকিলে, আবশ্যক কৃপা আপনিই জাগে—আশ্রয় গ্রহণ আপনিই হইয়া যায়। * * জীবের প্রসুপ্ত শক্তিকে জাগাইবার জন্যই 'ক্রিয়া' বা পুরুষকারের প্রয়োজন। জড়ের অন্তরালে এই চিৎ-শক্তি রহিয়াছে। * * শক্তির আরাধনা ভিন্ন শক্তিলাভ হয় না। সেই মহাশক্তির আরাধনা কর, নিজকে শক্তিময় কর, তেজোময় কর। পরমাত্মা কৃপা করিবার জন্য গুরুশক্তি রূপে নামিয়া আসিয়া, জীবের কাছে ধরা দেন, তাহাকে আকর্ষণ করেন, উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি যদি না নামিতেন, তাহা হইলে জীব কদাপি আত্মোদ্ধারের পথ চিনিতে পারিত না" * * * কিন্তু, "নির্ভর করিতে শিক্ষা কর; নির্ভর ভিন্ন জীবের গতি নাই। 'ক্রিয়া' কর, 'ক্রিয়া' কর—তাহাতেই 'নির্ভর' আসিবে।" শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেবও ঐ কথাই বলিয়াছেন—"* * * গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয়; গুরুদেবকে সমস্ত নির্ভর, ইহাই কর্ম্ম।" এই নির্ভরশীলতা বা আত্ম-সমর্পণই সাধনার চরম অধ্যায়। . . . .

মহাশক্তির সাধনাকেই বাবা শ্রেষ্ঠ তপস্যা মনে করেন। সেইজন্য তিনি প্রকৃত "কর্ম্মীর" নিকট সদাই জাগরূক বা প্রকাশমান। "প্রকৃত যোগীর স্থূল শরীর, লিঙ্গ শরীর এবং কারণ-শরীর চিন্ময় সিদ্ধ-শরীর রূপে পরিণত হয়। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত সদাই যোগ-যুক্ত থাকেন বলিয়া, ইচ্ছামাত্রই মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি আবির্ভূত হইতে পারেন"—এই কারণেই ঐ দিব্য-পুরুষের নিত্য-লীলা আজও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

তিনি আমাদের আশ্রয় দিয়াছেন; অর্থাৎ জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। একবার তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন—"যাকে যেমন অবস্থায় ফেলিয়া তৈয়ারী করিতে হয়, তাহাকে ঠিক সেই অবস্থাতেই ফেলিতেছি। মনে রাখিও, তোমাদের কল্যাণের জন্য যতখানি দেওয়া দরকার, তাহা আমি দিতেছি ও করিতেছি।" এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে আমরা বলিতে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহার সাক্ষাতে এক যোগী কোনও কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি আশীর্ব্বাদ করি—তোমার এই দারুণ ব্যাধি আরও কিছুকাল তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকুক।'

অভাব বা দুঃখ-নিবৃত্তি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। কিন্তু দুঃখ-বোধ না থাকিলে দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কেহ চেষ্টা করে না; বন্ধনের জ্বালা অনুভব না করিলে, কেহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছাই করে না। তীব্র দুঃখ ও অভাবের তাড়নার মধ্য দিয়াই মনুষ্য-হৃদয়ে জন্ম-নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবে জাগিয়া উঠে ও পরমাত্মার প্রতি তাহার চিত্ত উন্মুখ হয় এবং

মোক্ষ বা মুক্তিলাভের জন্য মনে ব্যাকুলতা জন্মে। বাবা বলিয়াছেন—"* * * এই অশান্তির মূলে যে একটি গভীর অভাব রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দীনের ঐশ্বর্য্য-লালসা, বদ্ধের মুক্তি-কামনা, রূপানুরাগীর রূপ-তৃষ্ণা, কামুকের কাম-পিপাসা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলিপ্সা—যাহার যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক, সেই এক আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর। * * মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্ব-ভাবের উপলব্ধি। জীব স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইয়াই দুঃখের কূপে নিপতিত হইয়াছে। পুনরায় সাধনা প্রভৃতির দ্বারা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, তাহার যাবতীয় অভাব মিটিয়া যাইবে। * * স্থূল ভাবের নির্মোক হইতে মুক্ত হওয়াই 'মুক্তি'। স্থূলের সঙ্গ হইতে প্রিয়াপ্রিয় বোধ জাগে, অথবা সুখ-দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়।"

(৪)

তোমায় দেখি যখন
তখন কেবল এই মনে হয়
দেখ্‌ছি যারে, সে তুমি নয়
তোমার আবরণ!

দেহের নিভা দীপে
আবার কিগো অচল শিখা
কাজল-পটে লিখবে রক্ত টিপে?

চিন্ময় রূপই ঐ দিব্য-পুরুষের যথার্থ স্ব-রূপ। তিনি এখন প্রকৃত স্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এই চৈতন্য-রূপের পূজা না করিলে, আমাদের ভিতরকার চিৎ-শক্তিকে কখনই জাগাইতে পারিব না—তাঁহাকে ধরিবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইবে। একটি জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার স্পর্শে যেমন সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে পারে, সেইরূপ আমাদেরও প্রসুপ্ত-অগ্নি তাঁহার

দিব্য-শিখার স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে! মানুষ তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় জড়-প্রকৃতি ভাবাপন্ন। স্থূলের মধ্যে তাহার চিত্ত অনুক্ষণ লিপ্ত থাকে বলিয়া, সূক্ষ্ম-সত্তা বা শুদ্ধ-চৈতন্যের আভাস মাত্রও সে সহজে লাভ করিতে সক্ষম হয় না। বাবা ত' বলিয়াছেন—"* * * সংঘর্ষ ভিন্ন এই স্থূল নাশের দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। * * জড়কে ধরিয়াই, জড়কে ছাড়াইয়া চৈতন্যে উপস্থিত হইতে হইবে।"

তাঁহার স্থূলদেহের বর্ত্তমান অবস্থায়, তাঁহার যে অসংখ্য লীলার দর্শন আমরা লাভ করিয়াছি, উহার অবসানাবস্থাতেও তাঁহার সেই সদা-জাগ্রত চিৎ-শক্তির লীলার প্রকাশ এখনও চলিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার দেহোত্তর কালের মাত্র কয়েকটি মুখ্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার রহস্যময় লীলা-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। মহাপুরুষের সম্পূর্ণ জীবন-কথা আলোচনা করা অসম্ভব, যেহেতু উহার বিরাট্ তত্ত্ব ও গুহ্য রহস্য বহির্জগতে কখনও প্রকাশ পায় না।

শ্রীশ্রীবাবার দেহ রক্ষার ঠিক তিন চারি দিন পরের কথা। আমার এক বিশেষ আত্মীয়া সুদূর নৈনিতাল জেলার একস্থানে তখন কিছুদিন যাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। বাবার সংস্পর্শে আসিয়া এই মহিলার তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি শিষ্যা ছিলেন না। যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন, তথায় ভূতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল; এই বাসস্থান ঠিক করিবার পূর্ব্বে ইহা জানা ছিল না। বাবার কলিকাতায় দেহরক্ষার তিন চারি দিন পরে দিনের বেলাতে স্বপ্নে তিনি বাবার দর্শন লাভ করেন। বাবা যেন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাসিতে

হাসিতে বলিলেন—'আমি ত' এইবার চলিলাম ; তুমি আর কখনও আমাকে স্থূলে দেখিতে পাইবে না। * * * ভূতের উপদ্রব আর থাকিবে না ; তবে তোমার বিছানার নিকট আমার ঐ ছবিখানি সর্ব্বদা রাখিয়া দিবে। ......লাউ খাওয়া তোমার পক্ষে খুব হিতকর'—এইরূপ বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন। বিষাদপূর্ণ এই স্বপ্ন-দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া আত্মীয়াটি চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই আমার নিকট উপরোক্ত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন। বিরহাগ্নিতে তখনও আমাদের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। ঐ পত্র পাইয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

এই ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে, আমি উপরোক্ত আত্মীয়ার সেই বাসাতেই গিয়া কিছুদিন অবস্থান করি। শুনিলাম, তিনি ভূতের উপদ্রব সেই বাড়ীতে আর দেখিতে পান নাই, যদিও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের লোকেরা তাহাদের বাড়ীতে উহা দেখিতে পায়।

নির্জ্জনে একাকী বেড়ান আমার অভ্যাস। দিনের বেলায় একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে একটি জঙ্গলের ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ দেখিতে পাই যে একটি বেশ বড় নেকড়ে-বাঘ পাহাড়ের উপর হইতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমার নিকট একটি ছাতা ভিন্ন আত্ম-রক্ষার জন্য কিছুই ছিল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ বাঘটিকে দেখিয়া আমি আমার অন্তিম সময়ের কথা ভাবিতে লাগিলাম—তখন শ্রীগুরুদেবের নাম স্মরণ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না ; ভয়ে বিহ্বল হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাঘটি ছুটিয়া আমার নিকট হইতে পাঁচ

ছয় গজ দূরে নামিয়া গেল এবং বিকট ভঙ্গীতে গর্জ্জন করিতে করিতে পথের অপর পার্শ্বে ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া গেল। বিমূঢ়চিত্তে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—কেনই বা প্রভু আমাকে রক্ষা করিলেন!

শ্রীশ্রীবাবার দেহ-রক্ষার আট মাস পরেই আমার পিতৃ-বিয়োগ হয়। উপর্য্যুপরি এই দারুণ আঘাতে মুহ্যমান হইয়া কাশী পরিত্যাগ করাই শান্তিপ্রদ মনে হইল এবং রাঁচিতে থাকিয়া বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত থাকাই শ্রেয় মনে করিলাম। এইস্থানে কিছুদিন পরে একটি দোকানও খুলিয়া বসিলাম। এখানে প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করিয়াছিলাম। কাশীর বাটী বিক্রয় করিয়া, তথায় একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিবার মনস্থ করিলাম। পাঁচশত টাকা বায়না জমা দিয়া একখানি জমী কিনিবার সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় পাকা হইয়া গিয়াছিল। বায়নার দলিল রেজিষ্ট্রি হইবার ঠিক পূর্ব্বদিন সেখানে এমন একটি পারিবারিক ঘটনা হইল যাহার ফলে কিছুদিন পরেই কাশীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিলাম। আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, যেহেতু ইহার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতের জীবন-ধারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া রাঁচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিলে, আমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকিত না—ইহা পরে হৃদয়ঙ্গম হইল। "তাঁহার করুণা, কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়া যায় কাহারে?"

রাঁচিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করায়, সেখানে আমার আবশ্যকীয় পুস্তকাদি ও নিত্য-সহচর দৈনন্দিন-লিপি পুস্তকখানিও (Diary)

লইয়া গিয়াছিলাম ; উহার মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুদেব সংক্রান্ত যে সকল কথা আমি মধ্যে মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, উহা পাঠ করিতাম এবং সেখানে গিয়াও উহার মধ্যে অনেক কথা লিখিয়াছিলাম। উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেই রাঁচির বাস উঠাইয়া দিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। বহু জিনিষ-পত্র ছিল, সেইজন্য মাল-গাড়ীতে অনেকগুলি পাঠাইতে হইয়াছিল। মাল-বাক্সগুলি যখন বাড়ীতে খুলিলাম, দেখি যে একটির মধ্য হইতে বহু দ্রব্য পথে চুরি হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে অন্যান্য পুস্তকাদির সহিত আমার সেই ডায়েরীখানিও ছিল। কয়েকটি মূল্যবান্ দ্রব্য, কিছু পুস্তক ও এই ডায়েরীখানিও ঐ বাক্সের মধ্যে বা অন্য কোথাও পাওয়া গেল না। মাল-বাক্সের পেরেক খুলিয়া ঐগুলি পথিমধ্যে চুরি হইয়াছিল। ডায়েরীখানি চুরি হওয়াতে আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল ; মনে হইল যেন গুরুদেবকে এই দ্বিতীয়বার জীবনে হারাইলাম ! দুঃখ ও বেদনায় কাতর হইয়া কতদিন তাঁহার চরণে অশ্রুপাত করিয়াছি, ও কতই না অনুযোগ জানাইয়াছি ! ঐ লিপি-পুস্তকের মধ্যে যে সকল কথা লিখা ছিল, উহা পাঠ করিলে মনে হইত—যেন তিনি আমার সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতেছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম স্তবকের সমস্ত বিষয়গুলি ঐ খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল। রাঁচিতে যাইবার সময় আমি দুই তিনটি বাক্স আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট কাশীর বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলাম। এখানে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে এই বাক্সগুলি খুলিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল। ইহাদের মধ্যে একটি বাক্স খুলিবামাত্রই

স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম যে আমার সেই হারান-নিধি দৈনন্দিন-লিপি পুস্তকখানি ঠিক উপরের স্তরেই রহিয়াছে। বহুকাল পরে নিরুদ্দিষ্ট পুত্র যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে জননীর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মাতার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, আমারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল। পুলকে আমার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। বাবার অসীম করুণা ও এই অসম্ভাব্য লীলা দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম ও বাড়ীর সকলে এই ঘটনা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল!

রাঁচীর ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিবার পর, কাজ-কর্ম্মের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও স্থিরভাবে থাকিতে পারিলাম না। অবশেষে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখিয়া একটি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষের কার্য্য মিলিল। এই কর্ম্মে পূর্ব্বে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। এক বৎসর এই স্থানে থাকিবার পর, অন্য আর একটি ব্যাঙ্কে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই উপরোক্ত কর্ম্মে পুনরায় বহাল হইলাম। এই অফিসে যোগ দিবার তিন মাস পরেই, প্রথম প্রতিষ্ঠানটি হঠাৎ দেউলিয়া হইল। ইহার এক মাস পূর্ব্বেই আমি আমার সমস্ত অর্থ ফেরত পাইয়াছিলাম—নচেৎ আমার সমস্ত অর্থ ডুবিয়া যাইত ও আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতাম। পরম করুণাময় গুরুদেব ভিন্ন কে আমাকে ঐ দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন?

প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোষাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত বৃহৎ হইলেও আমাকে একাকীই দৈনিক বহু সহস্র টাকার লেন-দেন করিতে হইত; সহকারী কেহই ছিল

না। প্রত্যহ কর্ম্মের চাপ এত অধিক থাকিত যে আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতাম। মধ্যে মধ্যে গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান (payment) করিয়া ফেলিতাম। অত্যন্ত কাজের চাপের সময় একবার একজনকে এক হাজার টাকার অধিক দিয়া ফেলিয়াছিলাম ; অল্প টাকার ত' কথাই ছিল না। গুরুদেবের অসীম কৃপাবশতঃ প্রত্যেকবারই আমি ঐ অর্থ ফেরৎ পাইতাম এবং অনুগ্রহকারিগণকে মধ্যে মধ্যে অর্থ-পুরস্কারও দিতে হইত।

একদিন কাশীর আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীবাবার লীলা-প্রসঙ্গ বিষয়ক সদ্যঃ-প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। পুস্তকখানির মধ্যে এত সুন্দরভাবে বাস্তব ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে উহার কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়াই আমি মুগ্ধ হইলাম এবং উহার একখণ্ড কিনিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। কিন্তু এই পুস্তকের মধ্যে যে সকল ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া একখানির স্থান দেখিয়া আমি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলাম। সূর্য্যের প্রখর রশ্মির মধ্যে খদ্যোতিকার দীপ্তি প্রকাশের চেষ্টা যেরূপ অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, ঐ ছবিখানিও সেইরূপ মনে হইতে লাগিল। একজন অলোকসামান্য মহাপুরুষের পার্শ্বে উহার স্থান আমার মনে অসহ্য জ্বালা উৎপাদন করিল। ভাবিলাম পুস্তকখানি ক্রয় করিবার পর উক্ত ছবিখানি খুলিয়া ফেলিয়া দিব, অন্য উপায় দেখিলাম না। বিক্রয়ের জন্য আশ্রমে তখন মাত্র পাঁচখানি পুস্তক রক্ষিত ছিল এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেকখানির মধ্যেই ঐ ছবিখানি দেখিতে পাইলাম। চারি পাঁচ দিন পরে পুস্তকখানি ক্রয় করিবার জন্য আশ্রমে গিয়া

একখানি লইলাম। যেখানি সর্ব্বপ্রথমে উঠাইয়া লইলাম, উহার মধ্যে সেই বিশেষ ছবিখানি খুঁজিতে লাগিলাম—পুস্তক হইতে উহা খুলিয়া বাহির করিয়া লইবার জন্য। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিন চারিবার চেষ্টা করিয়াও ঐ পুস্তক মধ্যে ছবিখানি খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল এবং অপর চারিখানির পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলাম যে আমার 'অবাঞ্ছিত' ছবিখানি সবগুলির মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাবার করুণার বিষয় স্মরণ করিতে করিতে পুস্তকখানি গৃহে লইয়া আসিলাম।

এই সকল ঘটনার পর বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও দৈনন্দিন-জীবনে শ্রীশ্রীবাবার দিব্য-পরশ যে কত ভাবে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতেছি উহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। ঐ সদা-জাগ্রৎ চিন্ময়-শক্তি আমাদিগকে চিরদিনই যেন আকর্ষণ করিয়া সত্যের পথে লইয়া যায়!—জয় শ্রীগুরু!

দুইটি গান

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

(২৯শে ১৩৩৫ সালে শ্রীশ্রীবাবার শুভ জন্মোৎসবে গীত)

কে বলে রে ভারত দুখিনী ?
এমন ছেলে পেয়েছে যে, সে যে সকল দেশের রাণী ।
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম হয়েছে যাঁর অধীন,
তাঁর মাকে কে বা বলিতে পারে গো কাঙ্গালিনী দীন হীন,
সেই রাজমাতা অবনী পরে, সেই বীর-প্রসবিনী ।
কত নরনারী সুপথে ছুটিছে আজ গো তাঁর কৃপায়,
তাহাদের তরে কত ক্লেশ বহিছেন এ ধরায়,
মূঢ়মতি মোরা বুঝিতে পারি না তাঁর লীলা তাঁর বাণী ।
এস ভাই সবে নরেন্দ্রের সনে গাও তাঁর জয় গান,
ভারত গগনে এস সবে মিলি তুলি একতার তান,
নমি ঐ পদে স্মরি ঐ পদে আর কিছু নাহি জানি ॥

(২)

(১৩ই মাঘ ১৩২৭ সালে গুরুদত্ত ক্রিয়া প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে)

আকুল পরাণে, কি জানি কি টানে
ধাবিত পাগল মন ।
ফিরে নাহি চায় বাধা পাছে পায়
অনিমেষ দু' নয়ন,

পলকে হারাই, খুঁজে নাহি পাই,
সে যে মম হারাধন,—
পাইলে এবার ছাড়িব না আর
রাখিব ক'রে যতন।
এই মনে করি বুঝি ধরি ধরি,
জানি না সে যে কেমন,
আঁধারে মিশায় ধরা নাহি যায়
চপলা মেঘে যেমন।
পাবে যদি তাঁরে ম'জ না সংসারে,
সে নামে থাক মগন,
ছিঁড়ে যাবে পাশ থাকিবে না আশ,
সফল হবে জীবন।
গুরুদত্ত বাণী মহাসত্য জানি
নরেন্দ্র কর সাধন,
তাতে যদি হয় এ দেহের লয়
ভাবনা নাহি তখন।

তিন জন্ম বিচার

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

সকলেই জানেন যে শ্রীশ্রীগুরুদেব দীক্ষাপ্রার্থী লোককে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তাহার প্রাক্তন তিন জন্মের সংস্কার বিচার করিয়া দীক্ষা দিতেন। সাধারণতঃ সাধন-সংস্কার ও প্রকৃতিগত ইষ্ট ভাবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিবার জন্য তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন জন্মের সাধন সংস্কার বিচার করিয়া কোন্ দিকে চিত্তের প্রবণতা অধিক তাহা দেখিতেন এবং তাহারই আনুকূল্য করিবার জন্য ইষ্ট-নির্ণয় করিয়া তদনুসারে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক দীক্ষা দিতেন। ইহাতে কৃত কর্ম্মের ধারার সহিত বর্ত্তমান কর্ম্মের ধারার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে প্রকৃত পথের প্রাপ্তি ঘটে। এই সম্বন্ধে শিষ্যগণের ব্যক্তিগত অনুভূতি স্পষ্টই উল্লেখযোগ্য।

ইহা হইতে বুঝা যায় পূর্ব্বের তিন জন্মের সংস্কার সাপেক্ষ-ভাবে পরিদর্শন করিয়া সাধন-জীবনের ধারাটি আবিষ্কার করিতে হয়। সাধনা ষোল আনা পূর্ণ হইলে একই পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে মার্গে সাধকের অধিক পরিশ্রম হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সাধন-সংস্কার অধিক বর্ত্তমান থাকে সেই মার্গই বর্ত্তমানে উক্ত সাধকের পক্ষে অবলম্বনীয়। তাহা হইলে পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হয় এবং পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্ম বর্ত্তমান

জন্মে ফলসিদ্ধির সহায়ক হয়। এ বিষয়ে কিছু কিছু বিবরণ "বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় খণ্ড বা তত্ত্বকথাতে দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা একটি স্থূল ব্যাপার মাত্র। গত তিন জন্ম ত দূরের কথা, ঐ প্রকার সহস্র জন্ম বিচার করিলেও প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ঐ তিন জন্ম বস্তুতঃ এক জন্মেরই ত্রিবিধ বিলাস মাত্র। স্থূল দেহ ধারণই স্থূল জগতে অর্থাৎ ভৌতিক স্তরে প্রবেশের চিহ্নস্বরূপ। স্থূল দেহ সর্ব্ব প্রথম কখন গ্রহণ করা হইয়াছিল ইহার ইতিহাস কেহ বলিতে পারে না। স্থূল দেহ জাত হয় এবং মৃত হয়—এই প্রকার জন্ম-মৃত্যু যে কতবার হইয়া গিয়াছে তাহারও সন্ধান কেহ জানে না। কালের জগতে নামিয়া আসা জন্ম-মৃত্যুর অধীন হওয়া, কিন্তু এই স্থূল দেহে প্রবেশ কোথা হইতে হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। যদি সেই সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে সেখান হইতে আরও উর্দ্ধে উঠিয়া সন্ধান নিতে হইবে যে মৌলিক আবরণ সর্ব্বপ্রথম কোন্ সূত্রে শুদ্ধ-চৈতন্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার "প্রকৃতি তত্ত্বে" বলিয়াছেন—"স্বভাবের ধারা ত্রিধা সৃষ্টি করা।" এই যে ত্রিবিধ সৃষ্টি ইহাই বস্তুতঃ আত্মার তিনটি জন্ম। এই তিনটি জন্মের বৃত্তান্ত নিপুণদৃষ্টিতে দেখিতে না পারিলে এই মায়িক জগৎ হইতে পরম স্থানে পৌঁছিবার ধারাটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পরম পথকে আবিষ্কার করাই দীক্ষার উদ্দেশ্য। এই তিন জন্মের মধ্য দিয়াই, অর্থাৎ এই ত্রিবিধ স্তর ভেদ করিয়াই, এই পথটি প্রসারিত রহিয়াছে। কোনও সাধকের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে তাহার মায়িক

দেহ, মহামায়িক দেহ এবং চিন্ময় দেহের প্রকৃতি অবগত হওয়া আবশ্যক।

বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপতঃ নিরাকার ও নির্ম্মল চিদ্-বস্তু। যখন সৃষ্টিমুখে উহা কালের রাজ্যে আগত হয় তখন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া উহাকে আসিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম চিৎ-স্বরূপ হইতে চিৎ-শক্তির যে সঙ্কুচিত উন্মেষ হয়—যাহাকে চিদণু বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে তাহা চিন্ময়ী শক্তির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে চিদাকার একটি স্বচ্ছ আবরণ তাহাতে যুক্ত হইয়া যায়। ইহা চিন্ময়ী শক্তির আবরণে আবৃত চিদণু। ইহাই অপরিচ্ছিন্ন বা পূর্ণ 'অহম্'এর প্রথম প্রতিবিম্ব। এই আবরণটি আত্মার প্রথম দেহ। এই দেহটি সাক্ষাদ্ভাবে কালের রাজ্যে আসে না। ইহা বিশুদ্ধ অচিৎ অথবা মহামায়ার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। মহামায়া নিজের উপাদান দ্বারা ইহাকে বেষ্টন করিয়া ইহার উপর দ্বিতীয় আবরণ সৃষ্টি করেন। ইহার পর চিন্ময় ও শুদ্ধ অচিন্ময় এই দ্বিবিধ আবরণবিশিষ্ট চিদণুটি মায়াগর্ভে প্রবেশ করে। মায়াগর্ভে প্রবেশের ফলে মায়িক উপাদান উহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহাই ত্রিবিধ আবরণ। এই মায়িক আবরণ পর্য্যন্ত যে তিনটি আবরণের প্রাপ্তি তাহাই চিদণুর ত্রিবিধ দেহ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এক এক প্রকার আবরণ পাওয়াকে এক এক প্রকার জন্ম লাভ বলা চলে, সুতরাং তিন প্রকার আবরণ-প্রাপ্তি ফলতঃ ত্রিবিধ জন্মেরই দ্যোতক। মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া জীব কালরাত্রির রাজ্যে উপনীত হয়। আমরা যে স্থূল দেহ দেখিতে পাই তাহা কালের দেহ। ইহা পরিণামশীল এবং ক্ষয়-

প্রধান। এই দেহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আরোহ-ক্রম ধরিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকৃতির স্তরে উত্থিত হইতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব নিজের পরম স্বরূপে উপনীত হইতে পারে না।

কালের দেহ দীক্ষা জন্য সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে এবং মূল স্থানে ফিরিবার পথ না পাইলে অসংখ্য বার কালের আবর্ত্তেই ঘুরিতে থাকে। এই আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ইহার পক্ষে ফিরিবার রাস্তাটি জানা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনটি পূর্ব্ব জন্মের প্রশ্ন যোগীর বিচার-পথে উপস্থিত হয়। কাল হইতে বাহির হইতে হইলেই সর্ব্ব প্রথম মায়িক দেহ ভেদ করা আবশ্যক। মায়িক দেহ ভিন্ন কালের রাজ্যে প্রবেশ হইতে পারে না। সুতরাং ফিরিবার সময় কালের রাজ্য হইতে মায়াগর্ভেই প্রথম প্রবেশ করিতে হয়। ইহাই বিপরীত গতি। যে প্রকার মায়িক উপাদানে সাধকের নিজ মায়াদেহ গঠিত তাহারই অনুরূপ পথ ধরিয়া তাহাকে মায়া হইতে নির্গম লাভ করিতে হইবে। কারণ সকলের পথ সকলের জন্য নহে। মায়া হইতে নির্গত হইয়া মায়াতীত অবস্থায় স্থিতি নিলে পরম স্থানে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মায়ার বাহিরে গিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তখন যে মহামায়ার গর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মায়িক দেহ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল পুনর্ব্বার সেই মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর মহামায়ার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া চিৎ-শক্তিতে প্রবেশ করিতে হয়। কারণ চিৎ-শক্তি হইতেই চিন্ময় আবরণে আবৃত হইয়া জীব মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই ফিরিবার সময়

পুনর্ব্বার চিৎ-শক্তির গর্ভে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থান হইতে নির্গত হওয়া আবশ্যক। তখন নিজের বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

যতগুলি আবরণ জীব প্রাপ্ত হয় ততগুলি কর্ম্মের ভূমি তাহার রচিত হয়। অনাবৃত চিৎ-স্বরূপে কর্ম্মের কোন প্রশ্নই থাকে না। নামিবার সময় এক একটি আবরণ গ্রহণ করিতে হয়, পুনর্ব্বার ফিরিবার সময় ঐ আবরণকে কর্ম্ম দ্বারা কায়াতে পরিণত করিয়া চৈতন্যের সঙ্গে ঐ কায়ার অভেদ সম্পন্ন করিতে হয়। তদনুসারে আরোহ-ক্রমে সর্ব্বপ্রথম মায়িক দেহের কার্য্য হইয়া থাকে। শরীর কর্ম্মেরই জন্য। শরীরোপযোগী কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে সেই শরীর-ধারণের সার্থকতা হয় না। মায়িক শরীরের কর্ম্ম পূর্ণ হইলে জীব মায়ার অতীত হয় এবং তাহার আত্মসত্তা জাগ্রদ্‌ভাবে মায়াকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যের ইহাই প্রথম অঙ্গ। মহামায়ার শরীরে মহামায়ার আবরণ আছে বলিয়া তদনুরূপ কর্ম্মও আছে। ঐ কর্ম্ম পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত মহামায়ার শরীর অনিবার্য্য। কিন্তু ঐ কর্ম্ম পূর্ণ হইলে মহামায়ার স্তরও ভেদ হইয়া যায়। তখন যোগী মহামায়া হইতে নির্গত হইয়া মহামায়ারও অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। চরম অবস্থায় চিন্ময় শরীরেরও তদনুরূপ কর্ম্ম আছে। তাহা সম্পন্ন হইলে যোগী চিন্ময়ী শক্তির অতীত হইয়া চিন্ময়ী শক্তিকেও নিজ শক্তিরূপে ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকারে ত্রিবিধ শক্তিই তাহার নিজ শক্তিরূপে পরিণত হয়। জীব তিনটি আবরণ লইয়া আসে বলিয়া যোগ-মার্গে ফিরিবার সময় এই ত্রিশক্তির অধিপতি রূপে ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে নিজ স্থান লাভ করে।

সদ্‌গুরু দীক্ষার সময় যখন পূর্ব্ব তিন জন্মের বিচার করেন তখন বাস্তবিক পক্ষে এই তিন জন্মেরই বিচার করিয়া থাকেন। কারণ চিন্ময় অখণ্ড সত্তা পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। শুধু কালরাজ্যের স্থূল উপাদানের তিনটি প্রাক্তন জন্ম বিচারের দ্বারা অখণ্ড চৈতন্য পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী বিশ্ব প্রকৃতির অন্তঃস্থিত দীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ধারা নিরূপিত হইতে পারে না। প্রত্যেক প্রকৃতি হইতেই আকৃতির গঠন হয় এবং ঐ আকৃতি দ্বারা স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। দীক্ষাকালে দীক্ষার্থী গুরুদত্ত কায়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ কায়াতে দীক্ষার্থীর মায়িক, মহামায়িক এবং চিন্ময় কায়া অবিভক্ত ভাবে নিহিত থাকে। কর্ম্ম-সাধন যথানিয়মে সম্পন্ন হইলে ঐ সকল আকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য সমাহিত হয়। তখন নিজ ধামে স্থিতি লাভের যোগ্যতা জন্মে। স্থূল ভাবে তিন জন্মের বিচার সাধারণ অবস্থায় উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চরম মীমাংসা উহা হইতে পাওয়া যায় না। তিন জন্মের সূক্ষ্ম রহস্য সাধকের বোধগম্য হইতে পারে না বলিয়া তিনি সাধারণতঃ স্থূল ভাবেই ব্যাখা করিতেন। বস্তুতঃ এই রহস্য বুঝিতে পারিলে জন্মান্তর তত্ত্ব বুঝিবার পথ সুগম হয়।

শ্রীগুরুর কৃপা-স্মৃতি

শ্রীজীবনধন গাঙ্গুলী

আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের একজন নগণ্য শিষ্য। পূর্ব্ব জন্মের কিঞ্চিৎ সুকৃতির জন্য তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ লাভ করিয়াছিলাম। যদিও আমি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামের বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, ভাগ্যদোষে বাল্যে ছয় বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় এবং আমার পুণ্যবতী মাতা ঠাকুরাণী ব্যতিরেকে আর কোন অভিভাবক না থাকায় বহু বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু বাল্যকালে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। যখন আমার বয়স ১৬ বৎসর তখন কলিকাতায় বেরি-বেরি রোগ প্রথম দেখা দিয়াছিল এবং সেই রোগে আমি আক্রান্ত হইয়াছিলাম—আমার জীবনের কোন আশা ছিল না। সেই সময়ে আমার বাম স্কন্ধের পেশীতে পক্ষাঘাত হয়, বাম বাহুর কোন কার্য্য ছিল না এবং তৎকালীন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। তৎকালীন কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কর্ণেল কাল-বার্ট তাঁহার সহকর্ম্মী কর্ণেল বার্ড প্রভৃতি চারিজন বিখ্যাত চিকিৎসক সহ আমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার রোগ দুরারোগ্য ও ডান দিক্‌টা ঐরূপ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইব, অধিকন্তু আমার

জীবন-নাশেরও আশঙ্কা। বিখ্যাত বহু জ্যোতিষী দ্বারা আমার কোষ্ঠী বিচার করাইয়া জানা গিয়াছিল যে, আমার ২৩ বৎসর বয়সের মধ্যে অকাল-মৃত্যু-যোগ আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব সেই সময়ে আমার ছোট মেসো মহাশয়ের (কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের) বাড়ীতে পদধূলি দেন। সেই সুযোগে আমার মাসীমাতা ঠাকুরাণী অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আমার বিষয় জানান এবং শ্রীশ্রীবাবা আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করেন। আমার সৌভাগ্য বশতঃ কিছুদিন বাদেই তিনি আমাকে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষা-কার্য্য শেব হইবার পরই প্রকাশ করেন যে আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই এবং আরও বলেন যে বড় বড় ডাক্তাররা যাহাই বলুক আমার প্রাণ-নাশ তো হইবেই না, বরং আমার শরীরের দিন দিন উন্নতি হইয়া আমি কার্য্যক্ষম হইব। অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার দীক্ষার পর হইতে আমার শরীর ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং আমি দুই বৎসরের মধ্যেই অতি কার্য্যক্ষম হইয়াছিলাম। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে আমার ২৩ বৎসর বয়সে যখন আমি ৺পুরীধামে আমার ছোট মাসীমাতা ঠাকুরাণীর সহিত বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলাম। তখন তথায় আমি টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হই। তৎকালীন তথাকার সিভিল সর্জ্জেন ডাঃ পুলিপাকা আমাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং একদিন আমার মুমুর্ষু অবস্থা দেখিয়া আমার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। সেজন্য আমার মাসীমাতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সেই সময়েই আমি কিছু অনুভব করিয়াছিলাম এবং

তৎক্ষণাৎ আমি একটু চেতনা পাইয়া বলিলাম যে, আমার জীবন রক্ষা হইবে, তোমরা কাঁদিও না। পরদিন শ্রীশ্রীবাবার একখানা অভয়প্রদ পত্রও পাইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কিছুদিন বাদে আমি বিশেষ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলবান্ হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবার কৃপায় আমার আর্থিক উন্নতিও আরম্ভ হইয়াছিল। আমার দীক্ষার পর শ্রীশ্রীবাবা আমার জীর্ণ তিন-কামরা বাসস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে আমার মাসতুতো ভগিনীপতি খিদিরপুরনিবাসী ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল (পূর্ব্বোক্ত ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা) আমার পূর্ব্বপুরুষের অট্টালিকার ধ্বংসের বিবরণ দেওয়ায় শ্রীশ্রীবাবা বলিয়াছিলেন যে, বাড়ীটির পুনর্গঠন হইবে এবং আমার নষ্ট বিষয় সম্পত্তি পুনর্লাভ হইবে। আমার তৎকালীন শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে উহা কিরূপে সম্ভবপর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় ও তাঁহার শুভ ইচ্ছায় সাত আট বৎসরের মধ্যেই আমার পৈত্রিক ভদ্রাসনের পুনর্গঠন হইয়াছিল এবং নষ্ট বিষয়-সম্পত্তিরও অনেকাংশ পুনরুদ্ধার হইয়াছিল ও আর আর নূতন সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলাম।

আমার চৌত্রিশ বৎসর বয়সে আমার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া সেপ্‌টিক ও ফ্লেগমেশিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারেরা তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। তখন আমি অতি কাতর হইয়া শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইলে তিনি

বলিয়াছিলেন যে আমার স্ত্রী রক্ষা পাইবে ও ৬০ দিন বাদেই রোগের উপশম হইবে। ইহা বলিয়া আমার স্ত্রীর মেসোমহাশয় বিখ্যাত ডাক্তার ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ) শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীচরণ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ও রোগ আরাম হওয়া কঠিন, কারণ তাঁহার Practiceএ ও রোগ কখনও আরাম হইতে দেখেন নাই। তাহাতে শ্রীশ্রীবাবা বলিয়াছিলেন "তোমার মত ডাক্তার ও ভয় করিতেছ। যাও, নিশ্চিন্ত থাক, ৬০ দিন বাদেই রোগীকে বর্দ্ধমান হইতে বেলঘরিয়া লইয়া যাইবে। কারণ তোমার কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান যাতায়াতে খুব কষ্ট হচ্ছে।" অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ৬০ দিন বাদেই রোগীর বিশেষ উন্নতি দেখা দিয়াছিল এবং যোগীকে রিজার্ভ কামরায় ইন্‌ভ্যালিড্ চেয়ারে বেলঘরিয়া স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার সময় বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বয়, যাঁহারা উপরোক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, প্রচার করিয়াছিলেন যে, স্থানান্তরিত করিলে পথেই রোগীর মৃত্যু হইবে। কিন্তু আমি ও ডাঃ দেবেন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীবাবার উপর নির্ভর করিয়া কোন ভয় করি নাই। পরে বর্দ্ধমানের ডাক্তারদ্বয় রোগীর নির্ব্বিঘ্নে বেলঘরিয়ায় পৌঁছান সংবাদ পাইয়া ও তাহার দিন দিন শারীরিক উন্নতির বিষয় অবগত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার পর ঐ রোগীর উরুদেশ হইতে পায়ের গাঁঠ পর্য্যন্ত ঘা হইয়া পচন আরম্ভ হইয়াছিল। অনেক রকম চিকিৎসায় ও অটো ভ্যাক্‌সিন করাইয়াও ঘায়ের কোন উপশম হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা একটি মলম সূর্য্যবিজ্ঞানের দ্বারা

প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহার করিয়াই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। আমার কোষ্টী অনুযায়ী আমার স্ত্রী জীবিতা থাকিতে পারে না, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার কৃপায় আমার ৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী-বিয়োগ হয় নাই, বরং আমার স্ত্রী তাঁহার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত (আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধুর স্বাস্থ্যহানির জন্য এবং কনিষ্ঠ পুত্রের পত্নীবিয়োগ জন্য) পুত্রবধুদের সন্তানাদি লালন পালন কার্য্য ও সংসারের সমস্ত দেখা শুনা কার্য্য করিতে সক্ষম আছে।

আমার জেষ্ঠা কন্যার বার বৎসর বয়সে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে মাথার চুল উঠিয়া যায়, মস্তকের অধিকাংশ ভাগেই টাক পড়িয়া গিয়াছিল। অনেক রকম কবিরাজী বিলাত-ফেরৎ Skin Expert প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ও কোন সুফল না পাওয়ায় খুব কাতর ভাবে শ্রীশ্রীবাবার শরণাপন্ন হই। তিনি আমার উপর কৃপান্বিত হইয়া বলেন, "যদি পদ্মের নির্যাস জোগার করিতে পার তাহা হইলে একটা অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।" আমি বহু চেষ্টায় বহু প্রকার পদ্মের নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এমনকি ফ্রান্স হইতেও উহা আনাইয়াছিলাম। কিন্তু কোন নির্য্যাসেই প্রকৃত বস্তু পাওয়া যায় নাই। পরে কলিকাতার বাথ্‌গেট কোম্পানীর দোকান হইতে এক শিশি পাই এবং তাহা শ্রীশ্রীবাবার কাছে লইয়া যাইলে তিনি বলেন যে তাহাতে প্রকৃত জিনিষ মাত্র ছয় ফোঁটা আছে। তিনি সেই শিশি না খুলিয়াই, এমন কি শিশির প্যাকেট পর্য্যন্ত অটুট রাখিয়া, একটি ছোট পাত্র নিকটে বসাইয়া একটি লেন্স দ্বারা ফোকাস্ করিয়া শিশি হইতে ছয় ফোঁটা নির্য্যাস ছোট পাত্রটিতে পাত্রান্তর করিয়া লইয়াছিলেন

এবং সূর্য্য-বিজ্ঞান দ্বারা একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ছয় ফোঁটা নির্য্যাস বাহির করা দেখিয়া আমার গুরু ভ্রাতা ৺যোগেশচন্দ্র বসু (কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর) বলিয়াছিলেন, "বাবা, আপনি ঐ প্রকারে তো বাথগেট্ কোম্পানীর ঘর হইতে ঔষধটা যোগার করিতে পারিতেন।" তাহাতে বাবা হাসিয়া উত্তর দেন যে, তাহা নিশ্চয় হইত কিন্তু তাহাতে চুরি করা হইত। বলা বাহুল্য যে শ্রীশ্রীবাবার সূর্য্য-বিজ্ঞান দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ আমার কন্যার মস্তকে সপ্তাহ কাল লাগাইবার পরই তাহার মাথায় পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ও কাল চুল হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীবাবার অসীম কৃপায় আমি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছিলাম।

একচল্লিশ বৎসর বয়সে আমি পুনরায় দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাই এবং কলিকাতার তৎকালীন প্রায় সকল চিকিৎসকের দ্বারা কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল পাই নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া ৺পুরীধামে যাই। কিন্তু তথায়ও রোগের কোন উপশম হয় নাই। করুণাময় শ্রীশ্রীবাবার আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়। হঠাৎ একদিন সংবাদ পাই যে, তিনি ৺পুরীধামে আসিতেছেন। যেদিন ৺পুরীধামে পৌঁছিয়াছিলেন সেদিন ষ্টেশনে তাঁহারা শ্রীশ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। গাড়ী হইতে নামিবার পূর্ব্বেই আমার পুত্রকে দীক্ষা দিবেন প্রকাশ করেন এবং তথাকার আশ্রমে বসিয়া আমার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলেন যে, আমার শরীরে খুব কষ্ট হইতেছে, অতএব একটা

প্রতিকার করিয়া দিবেন। পরদিন প্রাতে আশ্রমে যাইলেই তিনি সূর্য্যবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া দ্বারা কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া আমার ডান বাহুর পেশীতে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং আমি সেই দিন হইতে সুস্থতা অনুভব করি ও দিন দিন আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তাঁহার কৃপায় আজ ৬৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি যুবা পুরুষের মত কার্য্যক্ষম আছি।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের ১৬ বৎসর বয়সে অকালমৃত্যু-যোগ ছিল। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার স্বাভাবিক কৃপাশীলতা বশতঃ ৺পুরীধামে পৌঁছিয়াই তাঁহার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ থাকা সত্ত্বেও আমার পুত্রটিকে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষা দান করিয়া বাহিরে আসিয়াই বলেন যে তাঁহার শেষ কার্য্য সমাধা হইল। আর তিনি এ জগতে থাকিবেন না—৺পুরীধাম হইতে ফিরিয়াই তিনি দেহ রক্ষা করিবেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আমি আমার নিজের ও পুত্রের জন্য তাঁহার শারীরিক অবস্থায় কিছু না জানাইলেও তিনি আমার এবং আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করিবার জন্যই ৺পুরীধামে যাইয়া তাঁহার অসীম কৃপা দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করি, কিন্তু অনেক বিষয় প্রকাশ অনুচিত বিবেচনায় তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলাম না।

———

গুরু বন্দনা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতের স্নেহস্নিগ্ধ মন্থর পবন,
অফুরন্ত সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছ'ন,
তন্দ্রালস মোহময় মদির আকাশ,
দিবসের ক্লান্ত নগ্ন ক্ষুদ্র অবকাশ,
দিগন্তের অস্তমান শত রক্ত ছটা,
অনন্ত অসীম নীলা নীলিমার ঘটা—
অজ্ঞাতে নিভৃতে যেন দেয় আজি আনি'
ব্যাকুল হিয়ায় তব অর্ধস্ফুট বাণী।
নিশীথের মৃদুমন্দ গন্ধভরা বাসে,
উচ্ছলিত তরঙ্গিত শুভ্র জ্যোৎস্নাকাশে—
উন্মুখ অন্তর মম স্পন্দনে স্পন্দনে
থেকে থেকে কেঁপে ওঠে তব পরশনে!
নিত্য নব রূপ ল'য়ে আমার ভুবনে
লীলাচ্ছলে ছেয়ে রাখো মোরে সারাক্ষণে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কয়েকটি উপদেশ বাক্য*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৫। কোন কর্ম্ম করিতে হইলে তাহা দৃঢ়তার সহিত সাধনা করিবে। যে কর্ম্মই কর না কেন, তাহাতে যদি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত করিয়া যাইবে। তখন এদিক্ ওদিক্ দেখিবে না, তাহাতে অবহেলা করিবে না, একনিষ্ঠ হইয়া সে কাজ করিয়া যাইবে, দেখিবে সুফল পাইবেই। তাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না, ব্রহ্মা বিষ্ণুও নয়। মনুষ্যের অসাধ্য কি আছে! তোমার মধ্যে যে কি শক্তি আছে তাহা তুমি জান না; দৃঢ়তা চাই, একনিষ্ঠ হওয়া চাই, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা চাই। সৎকর্ম্মে বাধা-বিঘ্ন ত আছেই। হ্যাগো, যাদের সঙ্গে একদিন ঘরকন্না করছ, তারা কি সহজে ছাড়তে চায়? নানা রকম কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস, অসৎভাব নিয়ে সর্ব্বদা দিন কাটাচ্ছ; তাহাদের সঙ্গে এতদিনের এত ভালবাসা মাখামাখি, আর তারা কি সহজে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে চায়? তাহারা অনেক চেয়ে চেয়ে দেখবে; কত রকমে তোমাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করবে; কিন্তু তুমি যদি আর তাদিকে গ্রাহ্য না কর, খুব দৃঢ় হও, তাহারা

---

* বিশুদ্ধবাণী, তৃতীয় ভাগে প্রকাশিত (পৃঃ ১৫৭—১৬৫) উপদেশ বাক্যের অবশিষ্টাংশ। —সম্পাদক।

ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে সরে পড়বে। দেখ্‌লে এর কাছে আর সুবিধা হ'বে না, তখন আর তোমাকে বিরক্ত করবে না। তখন তুমি নিশ্চিন্ত তোমার কাজ করতে পারবে। প্রথম প্রথম অনেক গোলমাল আসে, অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন তাহারা দেখিবে তুমি কিছুতেই টলিতেছ না, তখন আর তাহারা তোমার নিকট আসিবে না। অধিবাস সহ্য করতে হ'বে রে বাপু। গল্প জান ত ?

[এখানে 'বাঘের বিবাহে'র গল্পটি লেখা হয় নাই।]

২৬। প্রশ্ন—শ্রীভগবানের কৃপা না হইলে কি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় ?

উত্তর—আরে বেটা কৃপা ত আছেই। তাঁর কৃপার কি অভাব আছে ? কৃপা সর্ব্বদাই পূর্ণ মাত্রায় বর্ষণ হইতেছে। সূর্য্য কিরণ দিতেছেন, কিন্তু তুমি যদি ঘরের ভিতর বদ্ধ হয়ে বসে থাক সূর্য্য কিরণ তুমি ভোগ করিতে পার না। সেইরূপ কৃপা উপলব্ধি করিবার জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। আধার প্রস্তুত করিতে হয়। কৃপার জন্য প্রার্থনা করিতে হয় না। ক্রিয়া না করিলে, সাধনা না করিলে, যোগাভ্যাস না করিলে, তাঁর কৃপা যে তোমার উপর সর্ব্বদা বর্ষণ হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিবে না। তাঁর কাজ তিনি করিতেছেন। আমরা যে তাঁর ছেলেগো, ছেলেকে দয়া করবার জন্য কি বাবাকে বলে দিতে হয় গো। বাবা ছেলের মঙ্গলের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু ছেলে অজ্ঞান বশতঃ তাহা সব সময় বুঝিতে পারে না। তবে এসব 'বাবা' ছেলের মঙ্গল করতে যেয়ে ভুল করতে পারে, করেও থাকে ; তাঁর আর ভুল-

ভ্রান্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের জন্য কৃপা বর্ষণ করিতেছেন, আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কৃপা বুঝিবার জন্য, উপলব্ধি করিবার জন্য কর্ম্মের আবশ্যক। কর্ম্ম না করিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না। কর্ম্ম করা চাই বাপু, বচনে কিছু হ'বে না, শুধু কথায় কিছু হবে না। কর্ম্ম করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মভ্যো নমঃ।

২৭। কিছুতে ম'জনা বাপু, মজলেই মুস্কিল। সংসারী লোক, সবই করতে হ'বে। না করলে তারা ছাড়বে কেন? ছেলেমেয়ে, পরিবার, আত্মীয়—এসব ত আছে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। অর্থের আবশ্যক, সর্ব্বদাই আবশ্যক। মসলা ত চাই, তা না হ'লে ত আর কিছু চলবে না। কাজেই অর্থ রোজগারও করতে হ'বে; তবে তাহার জন্য নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিও না, মর্য্যাদা নষ্ট করিও না, অসৎ পথে যাইও না—সৎপথে সব কাজই করবে, করতে হ'বে। তবে তাতে ম'জ না। "পাত্রে পারদবৎ, পদ্মপত্রে জলের ন্যায়।"

২৮। প্রঃ—বাবা, ক্রিয়া করিয়া, সাধনা দ্বারা কিছু যে হচ্ছে তা বুঝব কি করে?

উঃ—এই ধর কলিকাতা হইতে কাশী যাইতেছ। কলিকাতা হইতে যতদূরে যাইবে কাশীর তত নিকট হইতেছ, কেমন? সেইরূপ সংসারে, বিষয়ে যত আসক্তি কমিতে দেখিবে, বুঝিবে সেই পরিমাণে অগ্রসর হইতেছ। এদিকে ক্রমে ক্রমে বিরক্তি আসবে, এসব আর তত ভাল লাগবে না। করতে হয় করছি,

নিস্কৃতি পেলেই বাঁচি, এইরূপ মনে ভাব আসিবে। তখনই জানিবে ওদিকে একটু ভালবাসা হয়েছে।

২৯। উপযুক্ত সময়ে সকল কাজ করিবে। সময় অতিবাহিত করিয়া অসময়ে কাজ করিলে সে কাজের সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না। ক্রিয়া ঠিক সময়ে করিলে তাহার যেরূপ ফল পাওয়া যায় —অসময়ে করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায় না। বিশেষ অসুবিধা না হইলে ঠিক সময়ে ক্রিয়া করিবে। রাত্রি চারটায় উঠিয়া ক্রিয়ায় বসিবে এবং সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত করিবে এবং সন্ধ্যায় ঠিক সূর্য্যাস্ত সময় ক্রিয়ায় বসিবে। ঐ সময় ক্রিয়া করিলে তাহাতে সুফল পাইবে। অন্যথায় সেরূপ ফল হইবে না। তবে সময় অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া যেন ক্রিয়া বন্ধ করিও না। একেবারে বন্ধ করা অপেক্ষা অসময়ে করা ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু ফল ত হ'বেই। তবে সময়ে করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। বাপু, মনে রাখিও "ক্ষুধার সময় খেতে না দিলে, ভাল লাগে না সুধা পেলে।"

৩০। অতিশয় মূঢ় লোকেই হঠাৎ সকল বিষয় বিশ্বাস করে; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা তাহা করেন না। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিবে, পরীক্ষা করিবে, তবে বিশ্বাস করিবে। সেই বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস, তাই স্থায়ী হইবে এবং তদনুসারে কাজ করিলে সুফল পাইবে।

৩১। প্রঃ—আপনি সর্ব্বদাই নিয়মিতরূপে ক্রিয়া এবং সৎ-কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসিবে কি করিয়া? কাহারও প্রবৃত্তি হয়, কাহারও হয় না; এরূপ কেন হয়?

উঃ—কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। সৎ-কর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে এমন অভ্যাস হইবে যে আর তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম নিজে চেষ্টা করে ক্রিয়ায় বসিতে হইবে, তারপর এমন হইবে যে না বসিলে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিবে। গুরু উপদেশ দেবেন, বলে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন, কাজ তোমাকে করিতে হইবে। যে কাজ করবে সেই তার ফল পাবে। দৃঢ়তার সহিত নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হ'বে, খাট্‌তে হ'বে। গাল গল্প করলে কিছু হ'বে না। ক্রিয়ার অভ্যাস করলে আর তাহা ছাড়্‌তে পারবে না। এই দেখ না বাপু, আমি আজ দুই তিন বৎসর নানা কারণে নানা প্রকারে ভুগিতেছি, কিন্তু কোন দিন দেখেছ কি নিজের কাজ বন্ধ গেছে। এই ত সব কাছেই শুয়ে থাকে, একদিন কি শরীর অসুস্থ বলে আসল কাজে অবহেলা করেছি? ঠিক রাত্র বারটা বাজলেই তখনি উঠে পড়েছি, আসনে বসেছি। আর শুয়ে থাকতে পারি নাই। নিজেকেই সব করতে হবে। আলস্য ত্যাগ করতে হ'বে।

জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তম পত্র

ওঁ তৎসৎ

জ্ঞানগঞ্জ
পঞ্জাব আশ্রম,
১৮৩৫, শুক্লপক্ষ।

নারায়ণ স্মরণবরেষু,

পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।
তথা জাগ্রদ্ দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া॥
অস্তি নাস্তীতি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চল স্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ॥

যখন কর্ত্তৃত্বপদকে পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কাজের এক বোধ হয়। এক বলিলেই এক হয় না। মন সকল দিকেই যাউক না কেন কার্য্যের সময় ক্ষণকালের জন্য ঠিক থাকিলে যোগের উপদেশ আমাদের যেমন সহজসাধ্য তাহাতেই প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে। তবে আসন ঠিকভাবে হওয়া কর্ত্তব্য। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত যোগপ্রাপ্তি কোন যুগে কোন কালে কোন মতে হইবে

না। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি। যিনি আত্মাকে জানেন তিনিই শোক হইতে পরিত্রাণ পান। তাঁহাকে পরব্রহ্ম জানিও। তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জানিয়া পরমপদকে পায়। তবে তুমি কে আমি কে ভাই ?

বিশুদ্ধানন্দ ভাই, আর নারে, আর না—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। সংসার শ্মশানভূমির ভীষণ দর্শনেও অসারকে সকলে সার ভাবে। প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আমিত্বের দাসত্বে বাধ্য হয়। বিশে ভাই, আমিত্ব কি ভয়ঙ্কর! কিছুতেই মানব-প্রকৃতিকে উচ্চ আদর্শের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহাতে আবার মায়ার বিবিধ প্রলোভন উপস্থিত। কিন্তু ইহা কি কর্ত্তব্য নহে যে এই সকল বিঘ্ন বিড়ম্বনা সত্ত্বেও গন্তব্য পথের [পথ ?] স্থির রাখিতে হইবে ? মুহূর্ত্ত সময়েই যদি শ্মশান-বৈরাগ্যকে আসক্তির পদতলে নিক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে কি হইল ? অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় পবিত্র বৈরাগ্যকে অন্তরে জাগ্রৎ রাখিয়া প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিলেই সংসারের নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ সত্যের অনুষ্ঠানে অনায়াসেই শান্তিলাভ হইতে পারে। ঠিক জ্ঞান কি ? বস্তুতঃ জ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব চেতন শক্তি। যোগীরা ইহাকে স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। স্মৃতি, বুদ্ধি, বাক্য, মন, দর্শন, শ্রবণ এ সকল ঐ শক্তিরই বিকাশ। ইহারা ও শম, দম, তিতিক্ষা ও দ্বেষ দম্ভ হিংসা প্রভৃতি শুভাশুভ উত্তম বৃত্তির মধ্যে বিচরণ করে [করতে ?] জ্ঞানস্বরূপ বিধাতা সকল প্রকার ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন। তাঁহারা সেই স্বাধীন শক্তি বশে সুখ, দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতেছে। পশুপক্ষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের

বিধানেও কোন যন্ত্রণার কারণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উচ্চ জ্ঞান বিশিষ্ট মানবগণ স্বাধীন শক্তির স্বার্থ প্রলোভনে পড়িয়া জ্ঞানকে নানাভাবে গ্রহণ করে। মানবের চিন্তাশক্তি সকল অপেক্ষা উন্নত। এজন্য কেহ গুরু-ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, একেবারেই উড়াইয়া দেয়। তাহার প্রমাণ তুমি ও তোমার শিষ্য বুঝিতে হইবে। এই যে জ্ঞান—বিভ্রাট্ ইহার তুইটি কারণ আছে। একটি শাস্ত্রে অবিশ্বাস, আর একটি রুচিগত স্বার্থচিন্তা। এই তুই অনুদার ভাব দ্বারা সরল প্রকৃতিকেও সন্দেহের তরঙ্গ-ঘোরে আকুল করিয়া তোলে। নদী যেমন বাধা প্রাপ্ত হইলে বহুদিকে প্রবাহিতা হয়, তেমনি তেজস্বী মনস্বীরাও স্বার্থচিন্তার উত্তেজনায় বিবিধ প্রকার যুক্তি পথে ছুটিতে থাকে। অনাবৃত সরল তত্ত্বের প্রতি তাহাদের আদতেই দৃষ্টি পড়ে না। যদি পড়িত তাহা হইলে সত্যের এত অনাদর হইত না, বৰ্দ্ধমান আশ্রমের এত বিভ্রাটও ঘটিত না।

অন্য শিষ্যের দ্বারা কার্য্য চালাইবে। যাহার এভাব তাহার নিকট আমার নির্দ্দিষ্ট আশ্রমের ভার গ্রহণার্থ সকলে অর্থ গ্রহণ করিবে না। নররূপী পিশাচ * * * ১৩১৯ সালে তোমায় কিভাবে পত্র লিখিয়াছিল তাহা মনে আছে কি? সেই হইতেই তাহাদের উপর আমি বিরূপ। পিশাচ তোমার নাম করিয়া না করিয়াছে এমন কার্য্য নাই। তোমার অগোচরে অযথা যাজ্ঞা করিয়া কি না করিয়াছে? অতি পাতক সমগ্র নষ্ট করিতে বসিয়াছে। তাহাকে তুমি সাবধান করিতে যাও। তুমি সাবধান করিয়া কি করিবে? * * * ঐরূপ ব্যবহার প্রায়

ধরিয়াছে। ঐরূপ প্রবঞ্চক হওয়াতেই ঐরূপ ঘটনা হইতেছে। কাহার উপর কৌশল পাতিয়া সকলে কার্য্য করিতেছে ? * * একটি প্রধান অন্ত্যজ। সে না পারে এমন কোন কার্য্য নাই। আরও জানিতে চাও তাহাদের সমস্ত বৃত্তি এবং সকলের সমস্ত বৃত্তি লিখিব। * * প্রভৃতি নরাধমদিগকে সাবধান হইতে বল। শুভ চায় ত সাবধান হইতে বল। তোমার নাম করিয়া যে সকল কার্য্য যাহার নিকট করিয়াছে বা বলিয়াছে তাহার নিকট যাইয়া সমস্ত সত্য বলিতে বল। এখনও যত্তপি ভাল চাহে। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু। তোমাকে যখন যাহা বলিয়াছি,তখন তাহা বলিতেছ বা করিতেছ। তুমি যাহা দেখ না বা বল না বা কর না তোমার জন্য আমি সমস্তই করিতেছি। তোমার দাস আমি, অথচ তুমি আমার দাস হইতে পার। তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি জান না। অথচ ঐ দুষ্কৃতেরা অনেক কার্য্য করিয়াছে। যাহা করিয়াছে তাহা সমস্ত মিথ্যা। সমস্ত প্রকাশ করুক তাহা হইলে অনেক পাপের লাঘব হইবে। তাহা হইলে ত্রিপুরা ভৈরবী তাহাদের জন্য কার্য্য করিবেন। ৯ই ভাদ্র হইতে * * যে ভাল গ্রহ পড়িবে তাহার দ্বারা শুভ কিছুই হইবে না, বিশেষ ক্রিয়া করিতে হইবে। তাহাকে সংবাদ দাও। আসিলে পত্রের মর্ম্ম সমস্ত বুঝাইয়া দাও। তোমায় এত বিশৃঙ্খলতা দেখিতে হইত না, তোমায় এত উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। ১৩১৮ সালের ১৩ই আষাঢ় বর্দ্ধমান আশ্রমে বসিয়া বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর কি ভাবিলে ? গুষ্করা হইতে তোমায় যখন বর্দ্ধমানের শিষ্যরা বর্দ্ধমানে আনিল তখন কি

ভাবিলে ? ভাবিলে এইবার ধর্ম্মের উন্নতি হইবে। সকলকে রীতিমত যোগশিক্ষা দিয়া পরম আনন্দে সকলে থাকিব, শিষ্য সকল জাতিস্মর হইবে, ত্রিকালজ্ঞ হইবে—কি আনন্দই হইবে। এখন কি হইতেছে ভাই ? তখন আর এখন। তোমার শিষ্য সকল ফল্গুনদীর ন্যায় থাকিয়া তোমার দ্বারা সকল কার্য্য করিয়া লইবে। হাঁ রে, দাস প্রভু যে চেনা ভার রে। অথচ সাবাস লওয়া চাই। ধন্য কাল প্রভাব! তোমার সেবাযত্ন দূরের কথা — অন্তরালে থাকিয়া মজা দেখিব। কি দুরদৃষ্টের কথা। ইহাতেই তাহারা ধার্ম্মিক ও যোগী হইবে। কোন কার্য্য না করিয়াও গুরুর যত্ন ও গুরুর কার্য্যে কেহ বাধা না দেয় এরূপ করিলে যে সিদ্ধ ও সর্ব্বজ্ঞ হয় তাহা তাহারা জানে না। আশ্রমের সুবন্দোবস্ত সকল শিষ্য যদি না করে তাহা} হইলে তুমি তথায় থাকিবে না, অন্যত্র যাইবে কিংবা আমাদের নিকট থাকিবে। আর যথেষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমান আশ্রমের ভার যাহার, তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া তুমি চলিয়া আসিবে। ঐ আশ্রম হইতে যাহা হইবে ভৈরবীদের হইবে। যদ্যপি শীঘ্র তাহারা উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করে তাহা হইলে যতদিন ইচ্ছা বর্দ্ধমান আশ্রমে থাকিতে পার। আমি অনেকবার বর্দ্ধমান আশ্রমে যাইয়াছি। বর্দ্ধমান আশ্রমের ভার আমি যাহাদের উপর ন্যস্ত করিতেছি তুমি তাহাদের উপর ন্যস্ত কর। উহারা যাহাকে বা যে শিষ্যকে ইচ্ছা তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবে। ইহারা যাহা বলিবে বা যাহা করিবে সকল শিষ্যই তাহাতে স্বস্তি করিবে। স্বস্তি না করিলে আমি তাহার বিশেষ

বিধান করিব। দুই হাজার শিষ্যের মধ্যে পনের শত শিষ্য বাদ দিব। * *

অষ্টম পত্র

নারায়ণ স্মরণবরেষু,

পরমহংস উমানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদ যথাবিধানে সম্ভাষণ-পূর্ব্বকং বিজ্ঞাপন পরং।

পিতৃসন্নিভ! মহাদুঃখ ও মহাভয়ই বন্ধু। মহাশক্তি মহামায়া জগৎ-প্রসবিনীর নাম সূত্রে অসীম আকাশে স্থিতিরূপা। মহাশক্তি মহানুগ্রহ ব্রহ্মনিষ্ঠা সদ্‌ব্রাহ্মণ মহাবিজ্ঞান, যিনি জগৎ প্রসব করিতেছেন এবং যিনি তাঁকে প্রসব করিয়াছেন তাহার তত্ত্বই সর্ব্বদা অনুসন্ধানে যিনি রত এবং করিতেছেন, মেঢ্রে চতুর্দ্দল, কণ্ঠে ষোড়শদল, চক্ষে দ্বিদল, মস্তিষ্কে সহস্রদল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যোগবিজ্ঞানে পরমযোগী। তিনি যাহাকে যেভাবে শিক্ষা দিবেন, উক্ত আদেশ অনুযায়ী যিনি কার্য্য করিবেন, নিশ্চয় তিনি প্রত্যক্ষ করিবেন ও বিজ্ঞান শিক্ষা অনুযায়ী ত্রৈলোক্যমণ্ডলং সূর্য্যস্থ বিজ্ঞানং শিক্ষা করিলে সকল বিষয় অধিকারী হইবেন। আবশ্যকীয় দ্রব্য ও দেবদেবীর দর্শন মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; অবশ্য সময় সাপেক্ষ। যিনি বিশ্বাস ও ভক্তিশূন্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করেন, তিনি নিশ্চয় মূলধনে বঞ্চিত হইবেন, চিরকাল দুঃখভোগ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি যে সকল বিজ্ঞান-যন্ত্রের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা পাইতে দেরী হইবে। * * পরে সমস্ত লিখিব। পূর্ব্বপত্রে অনেক বিষয় আপনাকে লিখিয়াছিলাম,

তাহা পরমারাধ্য পূজ্যপাদ গুরুদেবের আদেশানুযায়ী। তিনি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার শিষ্যদের মধ্যে সরলতা নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস খুব কম। যাহারা লোকের নিকট সৎ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা নিতান্ত মূঢ় ও মহাপাপী। এই সব দেখিয়াই আপনাকে সকল তত্ত্বের বিষয় জানিবার যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা বন্ধ রাখিয়াছেন। পাছে আপনার মানসিক বৃত্তি তাহাদের দেখিয়া খারাপ হইয়া যায় এবং যোগ বিজ্ঞানের অনিষ্ট হয় সেই জন্য। আপনি কোন বিষয়ে চিন্তিত হইবেন না। আশ্রমের সকল বিষয় সেইজন্য আপনাকে সঠিক তিনি লেখেন না বা বলেন না। আমি তাঁহার আদেশ অনুযায়ী লিখিতেছি। আমার এ বিষয়ে কোন দোষ নাই। আপনার ব্রহ্মচারী শিষ্যের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখন তাঁহারা এইখানেই থাকিবেন, পরে যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপে কার্য্য করিব। যে পত্রে বিশেষ আবশ্যকীয় গুপ্ত বিষয় আছে তাহা কোন শিষ্যের নিকট বা কাহারও নিকট এখন প্রকাশ করিবেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে যাহা আছে, যাহা ছাপাইতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা এখন বন্ধ রাখিবেন। বিবেচনা অনুযায়ী কার্য্য করিবেন ও ছাপাইবেন। আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে সেব্য-সেবকের ভাব বেশ আছে, তবে অহং শুষ্কজ্ঞানের তীব্রতাপে বিশুদ্ধ তত্ত্বের স্পর্শযুক্ত বা আস্বাদন বুঝিতে পারে না। তাহাদের পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। অনেকের ভিতর বেশ কার্য্য হইতেছে, অথচ অস্ফুটভাবে রহিয়াছে বটে ও ভাবিতেছে এতদিন কার্য্য করিতেছি

কি হইল ? নিজের দোষ নিজে বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ শুদ্ধ আত্ম-গরিমা। আত্মগরিমা-ঝটিকা বন্ধ হইলেই পাইবেই পাইবে। যে পর্য্যন্ত আত্মাভিমান কর্ম্মানুরাগ ত্যাগ না হইবে সে পর্য্যন্ত যোগ-বিভ্রাট্ হইবেই হইবে। কারণ যে ক্রিয়া-বা বীজ তাহাদিগকে দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত দোষ ও ক্ষোভ বিরহিত। ভাবিয়া দেখুন যোগীদের ইষ্টলাভ সত্ত্বেও প্রার্থনার বিরাম নাই। ইহা কি পরমানন্দের বিষয় নয় ? তাঁহাকে পাইয়াও আশার প্রবল স্রোত অনিবার্য্য প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কারণে জননী ও পুত্রের মধুর ভাবাদি শ্রেষ্ঠ। গুরুদেবকে যদি আন্তরিক মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গীয় পবিত্রতার অধিকারী হয় এবং তাঁর কৃপায় চেষ্টা শূন্য হইলেও স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরিণাম ব্যাপার পূজ্যপাদ স্বয়ং গুরুদেবই জানেন ও দেখিতেছেন। বঙুল আশ্রমের প্রতি আর দৃষ্টি নাই কেন ? তাহা তাঁহারা জানিতে বিশেষ ইচ্ছুক। যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে তাঁহার নিশ্চয়ই মহাভাবের আবির্ভাব হইয়া কাম-ক্রোধাদির অসার ভাব বিনষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া কলুষিত চিত্ত দূর হইয়া অপার আনন্দ আসিবেই আসিবে। আশ্রমের যে কার্য্যই হউক —আপনি দৃষ্টি রাখিবেন। আদান-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে নিজের নিকট শিষ্য রাখিয়া বলিয়া দিবেন বা নিজে করিবেন, তাহা হইলে শিষ্যদের কোন আপত্তি থাকিবে না। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ ভৃগুরাম পরমহংসদেব তিনি সমস্ত আশ্রমের আয় ব্যয়াদি সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন ; আপনি দেখিবেন না ইহার কারণ কি।

যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কেন সমস্ত জগতের ব্যাপার দেখিতেছেন এবং বিচার করিতেছেন, তাহার দণ্ড ও পরিত্রাণ দিতেছেন ? আপনি না যদি দেখেন বা করেন তাহা হইলে আপনাকে বিশেষ দণ্ড পাইতে হইবে এবং ক্রিয়াদি সমস্ত কাড়িয়া লইবেন। আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে বেড়াইতে আজ্ঞা দিবেন। আমার কোন দোষ নাই। তাঁর আজ্ঞা এবং তিনি সম্মুখে থাকিয়া আদেশ করিতেছেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। পরে সমস্ত বিষয় আরও লেখা হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিজ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হইলে যে সকল শিষ্য আপনার নিকট থাকিবে ও কার্য্য করিবে তাহাদের আয় ব্যয় যে সমস্ত হইবে, সমস্ত আশ্রম হইতে দেওয়া হইবে, তাহাদের কোন বিষয়েই অভাবের কারণ যাহাতে না থাকে তাহার ব্যবস্থা হইবে। আশ্রমের সেবা কার্য্যাদি মিতাহারীর ন্যায় ব্যবহার হইবে। ভোগ-যাতনা আরম্ভ হইলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে না। লালসা না ত্যাগ হইলে বিশুদ্ধ-আনন্দের আশা কোথায় ? পরে সমস্ত বিষয় তাঁহার আদেশ অনুযায়ী লিখিব। আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী, আপনা অপেক্ষা বয়সে অধিক হইলেও আমি আপনার দাস, আমার কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমাকে যাহা বলিলেন আমি তাহাই লিখিলাম। ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে যাহা লেখা হইয়াছে যোগ-জ্যোতিষ প্রভৃতি উপযুক্ত শিষ্যকে এইবার দিতে পারিবেন। সূর্য্যবিজ্ঞান সকল শিষ্যকে দেখাইবার নিয়ম নয়, উপযুক্ত বোধে দিবেন। কারণ ইহার দ্বারা না হইতে পারে এমন কার্য্য কিছুই নাই। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

ভৃগুরাম পরমহংসদেব কাশী ও বঙ্কুল আশ্রমে গিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে যান। আপনার মানসিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নানা ঘটনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা আপনার শুভেরই লক্ষণ। এখন আমি আসি।

—উমানন্দ স্বামী।

কয়েকখানা ছিন্নপত্র

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

প্রস্তাবনা

এই সঙ্গে "কয়েক খানা ছিন্ন পত্র" নামে যে পত্রাংশগুলি প্রকাশিত হইল তাহা আমার নিকট লিখিত একজন সাধক গুরুভ্রাতার কয়েকখানা পত্রের অংশ। এইগুলি প্রায় ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিকট লিখিত হইয়াছিল। আমি যথা-সময়ে ঐগুলির উত্তরও দিয়াছিলাম। পত্র-লেখক শ্রীশ্রীগুরু-দেবের একজন কর্ম্মী শিষ্য। তিনি নিজের অনুভব-সংক্রান্ত বহু বিষয় মাঝে মাঝে পত্র দ্বারা আমার নিকট বর্ণনা করিতেন এবং এখনও করেন। একটি বিশিষ্ট প্রসঙ্গের আলোচনা আছে বলিয়া এই পত্রগুলি আংশিক ভাবে প্রকাশিত হইল। অন্যান্য পত্র এই বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া তাহা হইতে কোন অংশ উদ্ধার করা হইল না। লেখকের নাম অপ্রকাশিত রহিল এবং অপ্রকাশিতই থাকিবে। এই পত্রে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আমার নিজের বক্তব্য পত্রাংশের উপসংহার রূপে পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২)

প্রথম পত্র

দাদা, সত্যই কি আমি কোথাও গিয়াছিলাম ? এ জগৎ ছাড়িয়া ঐ রকম কোন স্থান প্রকৃতই আছে কি ? এটা আমার কল্পনা নয় ত ? বার বার যত পরীক্ষা করিয়া বাজাইয়া দেখি মনে হয় যেন সত্যই আমি ঠিক সেই একটি সুন্দর স্থানে, অতি পরিচিত অথচ নূতন স্থানে, স্নিগ্ধ রশ্মির মধ্যে পথ চলিতেছিলাম। খুব তীব্র আলো অথচ সূর্য্য-রশ্মির বা রোদের মত তীব্র ও প্রখর নয়, জ্যোৎস্নার অপেক্ষা আরও স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল প্রকাশ। এ জ্যোৎস্নায় পড়া যায় না, দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় না। সেখানে অতি দূর পর্য্যন্ত অতি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয়।

কতবার ভাবি যে লিখিব, কিন্তু এতই সঙ্কোচ ও লজ্জা মনে আসে যে লিখিতে পারি না—এতই সন্দিগ্ধ মন! সন্দেহ এইজন্য পাছে ভুল হয়, পাছে কল্পনা হয়। অথচ উহা এতই পরিষ্কার সত্য যে যখন দেখি বা পাই তার অপেক্ষা এই জগৎ অতি তুচ্ছ, অতি ম্লান, ক্ষণ-ভঙ্গুর মনে হয়। এটা যেন আজ আছে কাল নাই, সেটা যেন চিরদিন চিরকাল শাশ্বতভাবেই আছে ও থাকিবে। দাদা, এ জগতে ইহা সকলে হেঁয়ালি মনে করিবে, কিন্তু আপনি হেঁয়ালি মনে করিবেন না। আমি কেবল এটুকু জানিতে চাই আমার এটা স্বপ্ন নয় ত ? নিছক মায়াবীর কল্পনা বা ছায়াবাজীর মত নয় ত ? আমি এখন আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি, আপনি স্পষ্ট করিয়া জানাইবেন। আমি ভাবের ঘরে চুরি করিতে চাই না।

আমরা বাবার শিষ্য, প্রত্যক্ষবাদী, কেবল খেয়ালের উপর জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলিতে গেলেই বাবার বড় বড় দুটি চক্ষু জ্বলিয়া উঠে ও শাসন করে—"খবরদার, মিথ্যার আশ্রয় লইও না। যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই বিশ্বাস করিবে!" ইহাই বাবার বাণী।

মহানিশার আসনে কিছুক্ষণ বসিবার পূর্ব্বে কানের মধ্যে একটা গুন গুন শব্দ হইয়া আমাকে উঠাইয়া দিল। তারপর আসনে বসিবার পর একটা আলোময় রাজ্যে গিয়া পড়িলাম, যেন একটি সুন্দর পথ একটি বিরাট্ শ্বেত অট্টালিকার দিকে নিয়া যায়। সেখানে যেন কেহ নিয়া যাইবার জন্য প্রেরণা করিতেছে, কার যেন ডাক পড়িতেছে। সম্মুখ হইতে হাত ছিনাইয়া 'আয় আয়' করিয়া কে যেন ডাকিতেছে, অথচ কেহ ডাকেও না, কথাও কয় না, সব মৌন, চোখে চোখে তাকাতাকি হইয়াই যেন সব কথা হইয়া যায়। বেশী বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজনই হয় না। এমন যে পরিষ্কার ঝরঝরে জ্যোৎস্না তার ছায়া পড়ে না। আমি প্রথমে মনে করিলাম এতদূর হেঁটে যাব কি করে? ভাবিতেছি এত তীব্র রোদে কি ক'রে হাঁটব? এই সব ভাবিতেছি, হাঁটিতেছি কি,বসিয়া আছি তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু সেই বিরাট্ অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি। দূর হইতে সেই শ্বেত স্ফটিক-নির্ম্মিত অট্টালিকা বা মন্দির যত বৃহৎ মনে হইতেছিল নিকটবর্ত্তী হইয়া তত বড়ই দেখাইল—নিকট দূর বলিয়া যেন কিছু নাই। প্রথম প্রথম কয়েকদিন দরজার নিকট হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তখন মনে মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি নিজের আসন ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি? এই মনে করিয়া নিজের হাত দিয়া আসনটা feel

করিলাম; ছুঁইলাম; দেখিলাম যে আমি আসনেই বসিয়া আছি। ইহাতে আরও প্রমাণ হইল যে 'অজ্ঞান' হইয়া যাই নাই, সম্পূর্ণ চৈতন্য আছে, চৈতন্য হারাই নাই, সমাধিও নয়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। মনে হইল যে মন্দিরে প্রবেশ করিলে জানি না ফিরিতে পারিব কি না। তার পরদিন আবার সেখানে যাইবার জন্য কৌতূহল হইল। এতই প্রবল কৌতূহল যে না গিয়া থাকা যায় না। কিন্তু আমার দুষ্ট মন, সন্দিগ্ধ মন, কেবলই ভাবিতেছিল এই সব যা দেখিতেছি একটা খেয়াল মাত্র নয় ত? আসনের উপর বসিয়া ভাবিলাম আজ আবার যেতে পাব কি? যাইতে যাইতে জানু দিয়া টিপিয়া দেখিলাম—আসনের উপর আছি ত? শূন্যে নাই ত? আসনের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, হঠাৎ কখন্ যে সেই আলোময় জগতে গিয়া পড়িয়াছি তা মনেও নাই। সেই দিন আবার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। দেখিলাম একজন অতি সুন্দর পুরুষ আমারই মতন পথিক। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি যে তিনি নিশ্বাস লইতেছেন না—শ্বাস প্রশ্বাস নাই বলিলেও হয়। অতি কৌতূহলী হইয়া দেখিতেই তিনি যেন আমার প্রতি চাহিয়াই আমাকে বলিলেন, এখানে আসিলে কাহারও শ্বাস প্রশ্বাস বয় না। আমি তৎক্ষণাৎ জোরে শ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য চেষ্টা করিলাম, দেখিলাম যেন সত্যই আমারও কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ ছিল। মনে করিতেই শ্বাস বহিতে লাগিল। বিনা প্রয়াসে শ্বাস রুদ্ধ হইবার কি আনন্দ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। সেদিনকার মত আর মন্দির প্রবেশ করা হইল না। কেননা নিজের প্রতি লক্ষ্য করিলেই

ফিরিয়া আসিতে হয়। সন্দেহ হইলেই আর সেখানে থাকা যায় না। * * *

এ সব কথা কাহাকেও এখন বলিবেন না। পাছে কেউ শোনে এই ভয়। আপনাকে বলিব বলিয়া কতবার পত্র লিখিলাম, কিন্তু পাঠান হয় নাই। তবে মনে যখন প্রশ্ন উঠে তখন আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব?

* * *

মন্দিরে প্রবেশের কথা।

দ্বিতীয় পত্র

আপনাকে আমি পূর্ব্ব পত্রখানিতে ১০-৪-৪৫ হইতে আরম্ভ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কারণ ঐ তারিখ হইতে আমি কর্ণে ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম বিশেষ রকমে ও বিশিষ্টভাবে। তার পরে পাঁচ ছয় দিন পর হইতে ক্রমশঃ শব্দ যেন আলোকে পরিণত হইতে লাগিল। আলোক যত বেশী পরিষ্কার হইতে লাগিল উহার স্নিগ্ধতা ও উজ্জ্বলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে শব্দের ধ্বনি যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিল অর্থাৎ আলোকের সহিত শব্দময় বা শব্দমাখা হইয়া গেল। শব্দের সহিত আলোকের কিরূপ সম্বন্ধ? তখন আমি কোথায় থাকি?

এই পত্রখানি লিখিতে আজ এত বিলম্ব হইল কেন জানেন? আমি বোধ হয় খুব অপরাধ করিয়াছি, আপনি যদি নিকটে থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এত ভুল করিতাম না।

আমার ইচ্ছা হইল যে এই আলোকে বসিয়া আপনাকে পত্র লিখিব। মনে হইল এত স্পষ্ট আলোকে যদি পত্রই লিখিতে না পারিলাম তাহা হইলে ইহার মূল্য কি? আমার নিকট ঐ আলোকটি এতই স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল যে সেই আলোকে বসিয়া মন্দিরের বর্ণনা সহ বিস্তারিত পত্র লিখিতে সাধ হইল। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই দোয়াত কাগজ কলম লইয়া আসনে বসিলাম। সম্মুখে দৃশ্যপটে আলোক ফুটিয়া উঠিল—শব্দ ধীরে ধীরে মিশিয়া গেল, অর্থাৎ শব্দ যেন একেবারেই রহিল না। কেন? সেখানে শব্দ না থাকাটাই বেশী ভাল লাগে। এই সময় একটা প্রশ্ন করিয়া রাখিলাম—শব্দ, আলোক ও দৃশ্য এই তিনের মিলন হইলে কি হয়? জানিতে ইচ্ছা হয়। মাথা নীচু করিয়া যেই কলম তুলিয়া লিখিব অমনি ধীরে ধীরে আলোক অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহা করা উচিত ছিল কি? বোধ হয় খুব ভুল করিলাম।

মার্চ্চ মাসের ১৪ই ও ১৫ই তারিখে আমি প্রতিদিন সাদা সিঁড়ির উপরে যাইয়া বসিতাম,—মন্দিরের সিঁড়ির ষ্টেপ প্রায় সাত আটটা হইবে। মন্দিরের চারিদিকে বড় বড় থাম, আর থাম্বার মাঝে মাঝে পদ্মফুলের পাঁপড়ী যুক্ত আছে এবং প্রত্যেকটি পাঁপড়ী যেন প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছে। এই প্রকারে থামের চারিদিক আরতির প্রদীপের মত সাজান। মন্দিরের দরজায় বসিয়া কিছু দেখিতে পাইলাম না, মনে হইল যেন একটা সাদা পর্দ্দা দিয়া ঢাকা আছে। ১৮ই মার্চ্চ তারিখে পর্দ্দার মধ্য হইতে ফাঁক হইয়া গেল। ঐ স্থান হইতে একটি অতি সুন্দরী ষোড়শী রমণী মূর্ত্তি অতি কোমল, করুণ ও স্নেহার্দ্র বচনে যেন আমাকে বলিলেন,

"ভিতরে এসো।" আমি কলের পুতুলের মত ভিতরে গিয়া দেখি মাথার উপরে অতি সুন্দর চন্দ্রাতপ, তাহার চারিধারে ফুল-দেওয়া ঝালর। দেখিতে এই প্রকার—᭼᭼᭼᭼᭼᭼᭼᭼᭼᭼। মধ্যখানে একটি খুব বড় লাল পদ্ম। মেজেটি স্ফটিকের দ্বারা নির্ম্মিত—ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমি আদেশ পাইয়া সেখানে গিয়া বসিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম, তাই মেজেতে গড়াইয়া পড়িলাম। মাথার শিয়রে তিনি (দেবী) আসিয়া বসিলেন ও আমার মাথা তাঁহার কোলের উপর রাখিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর সকলে কে কোথায়?" উঃ—"সকলের সহিতই সাক্ষাৎ হইবে।" আবার প্রশ্ন করিলাম, "বাবা কখন আসিবেন?" উঃ—"বাবা এখানে আসিবেন না।" আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি তাঁহার দর্শন এখানে কোনদিন হইবে না?" উঃ—"না, কখনই না। তিনি এখানে আসিবেন না। তাঁহার দর্শন পাইতে হইলে অনেক দূর যাইতে হইবে, এত উতলা ও ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন। স্থির হও, শান্ত হও, ক্রমশঃ সমস্ত হইবে। তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে এত চঞ্চল হইলে চলিবে না। এখানে স্থিরভাবে কিছুদিন থাকিবার পর সেই স্থান অতি সুগম হইবে। তখন অতি দূর পথ—অতি নিকট হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনই তাঁহার দর্শন এখানে পাইবে না। তবে তাঁহার দর্শনের পথ এই—এই পথে ক্রমশঃ স্থির হইতে পারিলে ঐ অখণ্ড মণ্ডলাকার রাজ্যে গিয়া পড়িবে।" এই বলিয়া তিনি সম্মুখে একটি খুব বড় মণ্ডলাকার আলোকের প্রকাশ দেখাইয়া বলিলেন, "উহা ভেদ

করিয়া আরও দূরে গিয়া বাবার রাজ্য পাইবে। সে অনেক দিনের কথা—এখন স্থির হও, শান্ত হও।" এই বলিয়া তিনি আমাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন আমি ততই উতলা ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। দেবীকে বলিলাম, "যখন এখানে বাবার দর্শন পাইব না তখন আর এখানে থাকিয়া কি করিব ? চলিলাম।" বলিতেই যেন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আবার পথে আসিলাম। দেখিলাম সেই আলোকের পথের তুইধারে আরও কত লোক ছোট ছোট বেদীর উপর বসিয়া ধ্যানস্থ আছেন। এক একটি বেদী দেখিতে এক একটি পদ্মফুলের মত মনে হইতেছিল। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হইল যেন ইঁহারা সকলেই বাবার দর্শনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি যদি খুব বেশীক্ষণ ধরিয়া থাকিতাম তাহা হইলে খুব ভাল হইত, শেষ কালে যেন আমার একটু পরিতাপ হইতে লাগিল। ক্রিয়া পাইবার পর হইতে এই ভুল আমি প্রায়ই করিয়াছি—ক্রিয়া করিতে করিতে যখনই আনন্দের সময় আসিয়াছে, সংখ্যা শেষ হইল আর উঠিয়া পড়িলাম। আরও বসা উচিত।

-১৯।২০ তারিখে আবার গেলাম। সিঁড়ির উপর গিয়া বসিব এমন সময় একটি দিব্য-পুরুষ অতি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ভিতরে যাও, মন্দিরে গিয়া মার নিকট স্থির হইয়া বস, সব মঙ্গল হইবে, উতলা হইও না।" আমি আমার স্বাভাবিক রুক্ষভাবে বলিলাম, "বাবার দর্শন যখন হইবে না তখন আমার এমন মন্দিরের প্রয়োজন নাই। বাবার দর্শনের জন্য আমি

এদিক্ ওদিক্ কতদিক্ গেলাম, সকলেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে বলে, আমার এত ধৈর্য্য নাই। বাবা আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তীব্র ইচ্ছা হইলেই দর্শন পাইবে।' এখানে আপনারা সকলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, জানেন না কত কাল পড়িয়া থাকিতে হইবে। মার কবলে কত কাল থাকিব ?" ইত্যাদি বহু কথা অভ্যাস মত বলিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। তর্ক যেন কোথায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল। আহা! সেই মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকার মত সুখ কোথাও অনুভব করি নাই। কিন্তু কি যে ভুল সংস্কার! যেন থাকিতে দেয় না—মনে হয় এই আনন্দে ডুবিয়া গেলে আর ফিরিতে পারিব না। আমি ত এই শরীরেই একবার বাবার দর্শন চাই, নইলে জীবন পণ করিয়া রাখিয়াছি শেষ জীবনে আহার পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া পড়িয়া থাকিব। হয় বাবার দর্শন হউক নইলে এই শরীরের পতন হউক, ইহাই আমার সঙ্কল্প থাকিবে জীবনে অনেক বার পালাইয়াছি, এইবার আর ফিরিব না, এইবারই শেষ। বাবার দেহরক্ষার পর হইতে আমার মনের সঙ্কল্প এই রহিয়াছে যে আমি স্বর্গ চাই না, দিব্য জ্যোতি চাই না, আমি চাই একবার বাবার দর্শন। সে কবে হইবে জানি না।

ঐ দেব-কন্যাটির রক্তবসন পরণে ছিল, তিনি একটি পরিবেশ দ্বারা আবৃত ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলাকার একটি Halo বা প্রভামণ্ডল ছিল। তার মধ্যে মুখখানা অতি কোমল ও অতি পরিচিত, যেন নূতন করিয়া অচেনাকে চিনাইয়া দেবার

প্রয়োজন নাই। কিন্তু ওখানে গিয়াও আমার এক্-রোখা ভাব গেল না। আমি বহু দিন হইতে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে কখনও কোন দেবতা বা মহাপুরুষ আসিলে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, তিনি যেন দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া বাবার নিকট চলেন, কারণ আমি জ্যোতি-দর্শনের আবেশের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাই না। সেখানে যে সব দেবতা বা ভক্তগণ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন আমি তাঁহাদের সকলকেই এক বাক্যে এই কথা বলিতে চাই যে এখানে সকলে আবদ্ধ না থাকিয়া আমরা আরও এগিয়ে চলি। যখন আমরা সকলে বাবার দর্শনই চাই তখন এখানে বসিয়া থাকিয়া ফল কি? সকলকেই বলিব মনে করি, কিন্তু বলা হয় না। পরে অন্যান্য বিষয় লিখিব।

তৃতীয় পত্র

এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়া একটা খুব বড় সন্দেহ ভঞ্জন হইল। দৃশ্যটির বর্ণনার সময় আমার বার বার মনে হইতেছিল যেন ইহা সেই 'হরিদ্বারের মহাপুরুষটি'র চক্রান্ত। তিনি বলিয়াছিলেন, "একদিন এইরূপ একটি রাজ্যে গিয়া সকলেই উপস্থিত হইব, যেখানে আর অপরিচিত বা ভেদাভেদ বলিয়া কিছুই থাকিবে না। সেখানে আমাকে ও অন্যান্য বহু লোককে (তাহাদের নাম করিলেন) সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।" আমি দৃশ্য দেখিয়া মনে করিতেছিলাম যে, ইহা হয় তো ঐ মহাপুরুষের মায়াজাল। তিনি এই প্রকার একটা আশ্রম করিয়া আমাদের সকলকে আবদ্ধ করিয়া নিজে হয় তো মহাপ্রস্থান করিবেন। কেননা তাঁহার

কথায় মনে হইতেছিল যে, তিনি ঐরূপ একটা আশ্রম বা দিব্য জগতের আবিষ্কার করিবেন বা স্থাপনা করিবেন। আমার মনে এইরূপ একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু পরে জানিলাম যে ইহা বাবারই কৃপা।

মন্দিরটি পাহাড়ের নিকটস্থ নদীর ধারে বলিয়া মনে হয়। নদীতে জলের স্রোত ছিল, কিন্তু কুল কুল শব্দ ছিল না—যেমন পর্ব্বতের ক্রোড়ে নদীর প্রবাহের শব্দ হয় সেই রকম শব্দ ছিল না। অনেক গাছ ছিল, তার নীচে ছোট ছোট বেদী গোল-গোল পদ্মফুলের মত স্থাপিত ছিল। কতকগুলি শূন্য ছিল এবং কতকগুলির উপর সাধকেরা উপবিষ্ট ছিলেন। আমি যখন গেলাম তখন প্রথম দিন তাঁহারা সকলেই আহ্নিক সারিয়া আসিলেন। পরদিন যেন কতই ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি আসনে গিয়া বসিবেন বা ধ্যানস্থ হইবেন বা নিজ আলয়ে ফিরিয়া যাইবেন এইরূপ একটা ভাব।

চতুর্থ পত্র

মন্দিরের চারিদিকে পাখী ছিল, কিন্তু পাখীর ডাকের শব্দ ছিল না। মানুষের শব্দহীন কথা বা ভাষা ছিল। তাকালেই যেন কথা হইয়া যাইত। যেন চোখে-চোখে কথা হইয়া যাইত, মনে হইত যেন কর্ণের কোন প্রয়োজন নাই। গাছের পাতা বায়ুতে নড়ে, কিন্তু পত পত শব্দে নাই। প্রথমে কেমন গভীর ঝিল্লী রব, তারপর সব কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যেন এক নিস্তব্ধ ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল এটা যেন একটা শব্দহীন জগৎ। এইরূপ একটা বর্ণনা সেই হরিদ্বারের মহাপুরুষের নিকট শুনিয়াছিলাম।

তবে আমার ইচ্ছা মহাপুরুষের বর্ণিত কোন স্থান বা অবস্থাতে যাইব না, তাহাতে চিত্তে নিষ্ঠার অভাব বা ব্যভিচারের ভাব আসিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা হয়। * *

পঞ্চম পত্র

আমার কাছে পঞ্জিকা নাই, ঠিক জানি না কবে একাদশী। আমাকে দেখিবামাত্র সাধুটি বলিলেন, "এই যে ভায়া, চল শীঘ্র চল। আজ একাদশী, মা আগে আগে গিয়াছেন, গঙ্গা পার হইতেছেন, এই সময় আমরা পিছু পিছু যাইব, তাহা হইলে বেশ আরামে পার হওয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন। আমরা গঙ্গার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইলাম। পায়ের তলায় জল যেন বরফ-জমার মত শক্ত মনে হইল। পার হইয়া দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গুহা অবস্থিত। তার মধ্যে এক একজন সাধু থাকিয়া তপস্যা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে কিছুকাল বাবার সমস্ত শিষ্যকে আসিয়া থাকিতে হইবে, তারপর আবার অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। আমার বেশ মনে আছে, আমি বলিলাম, "গুহার দরজা নাই, এমন খোলা স্থানে আহ্নিকের কার্য্য কি করিয়া হইবে?" তখন সাধুটি বলিলেন, "সে সব ব্যবস্থা হইবে, চিন্তা নাই। এখানে খুব আনন্দ করা যাইবে।" আমরা ফিরিয়া আসিলাম। [এইটি ৩-৮-৪৫ এর ঘটনা]

ষষ্ঠ পত্র

একটি প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জ্যোতিকে অনুসরণ করিতে করিতে শেষকালে উহা দৃশ্যে পরিণত হয়—শব্দ

যেন দৃশ্যের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। কিন্তু যখন কেবল শব্দকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকি তখন কোন দৃশ্যও থাকে না আর শব্দও থাকে না, থাকে কেবল শূন্যময় জগৎ। এ অবস্থায় আনন্দ খুব বেশী মনে হয়। দৃশ্যে যেন অরুচি হইয়া আসিতেছে। এখানে কোন দৃশ্য নাই অথচ খুব বেশী স্ফুর্ত্তি ও প্রশান্ত ভাব। আমার প্রশ্ন এই—জ্যোতিকে লক্ষ্য করিয়া চলা প্রশস্ত না শব্দকে লক্ষ্য করিয়া চলা প্রশস্ত? আমার মনে হয় আরও বেশীক্ষণ অনবচ্ছিন্ন ভাবে স্রোতের টানে থাকিলে তুইটাই এক হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সময় বেশী দিতে হয়।

সপ্তম পত্র

ইতিপূর্ব্বে একাদশীতে একখানা পত্র দিয়াছি, তাহাতে একটা ভুল বা রহস্য আছে বুঝিতে পারিলাম না। আজকের একাদশীতে বিশেষ করিয়া সাবধানে রাত্রি দেড়টার সময় আসনে বসিলাম। যে সাধুটি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মা বাবার কাছে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবেন, আজ তিনি নিজেই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এই যে—ভায়া, গত বারে একাদশীতে আমি আসিতে পারি নাই। গঙ্গাতটে মহাযাত্রার সময় অতি নিকট। যে সমস্ত সাধু আজ হাজার হাজার বছর হইতে সাধনায় রত তাঁহারাও গঙ্গামুখী বা তটের নিকটস্থ হইতে পারেন নাই। কয়েক লক্ষ সাধুর মধ্যে মাত্র কিছু লোককে মা সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবেন। গঙ্গা নদী পার হইয়া আরও অনেক উচ্চে বাবার স্থান। তাকে যদি কৈলাস বলি তাহাও ঠিক বলা হয় না। ঐস্থান কৈলাস

অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও অনেক বড়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গতবারে যে নদী পার হইলাম সেটা কি গঙ্গা নদী নয়?" উত্তর —"কত শত নদী পাবে, তার কোনটাই গঙ্গা নদী নয়। এখানে অনেক সাধুর এই ভ্রম আছে যে তাঁহারা মনে করেন এই ছোট ছোট নদীই গঙ্গা। শাখা-প্রশাখা কত দেখিবে, তার কোনটিই গঙ্গা নয়, সব ছায়াচিত্র বা স্বপ্নবৎ। ঐগুলি আজ আছে, কাল নাই। এখানকার কোন দৃশ্য স্থায়ী নয়, এখানে আত্মস্থ হইয়া বসিলে সব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ, ঠিক জলের বুদ্বুদের ন্যায়। এই প্রকার দৃশ্য কিছুদিন দেখিতে দেখিতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই ছায়াবাজী ছাড়া একটি মহাসত্য আছে, যাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। তবে এখানে বসিয়া ঠিক এখানকার মত হইয়া ডুবিয়া থাকিতে হইবে। যখন মন প্রাণ বেশ ডুবিয়া যাইবে, তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন আরও অগ্রসর হইবার অবসর হইবে। সেই অবসরে মা নিজে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবেন। মাকে ছেড়ে এক পা অগ্রসর হইতে পারে মানুষের এতটুকু শক্তি নাই। কত লোক লক্ষ লক্ষ যুগ তপস্যা করিয়াও এক পা অগ্রসর হইতে পারে নাই। যুগ-যুগান্তর হইতে বিরাট্ পর্ব্বতের প্রস্তরের ন্যায় কোটি কোটি সাধু অচল অটল ভাবে এই নদীর তটে যোগাসনে বসিয়া আছেন, সকলেই মার ক্ষণিক কৃপার প্রার্থী। আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে সেই কঠোর তপস্যা হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। আমরা বাবার কৃপায় ও মার অনুকম্পায় কঠোর তপস্যার দুর্গম পথ যে এত সুগম হইতে পারে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এখানে কিছুই বলিবার নাই, কেবল

চুপ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গদ্‌গদ চিত্তে অশ্রু বর্ষণ কর, কত জন্মের কত অসৎ কর্ম্ম কোথায় কে চকিতে ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে বুকে করিয়া নিয়া চলিয়াছে। বিশ্বাস কর বা না কর, কর্ম্ম কর আর না কর, অনুকম্পা হইতে আমরা কেহই বঞ্চিত হইব না। এত বড় আশ্বাস আর কোথায় পাইব? যুগ যুগ ধরিয়া যে সকল যোগী কঠোর তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা যখন বিচার করি তখন মনে হয় ইহারা অসীম শক্তি-সম্পন্ন হইয়াও ঐ মায়ের এতটুকু কৃপার ভিখারী হইয়া এখানে এদিক্ ওদিক্ পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে—তবে কি এই সব তপস্যা সবই বৃথা! উত্তর—না। এই সমস্ত যোগী নিজের আত্মকর্ম্ম দ্বারা নিজের দুষ্কর্ম্মগুলি কঠোর তপস্যা বলে ধ্বংস করিয়া জীবের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। ভাবিয়া দেখ কাদের কর্ম্মফলে আমাদের দুষ্কর্ম্ম কুকর্ম্ম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং আমরা মায়ের কোল প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল সাধুদের তপস্যার ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে। ইহারা কেহই আমাদিগকে সঙ্গে না নিয়া অগ্রসর হইতে চান না। মা যেন সারথি, এই সাধুরা যেন অশ্ব আর আমরা যেন রথের উপর বসিয়া বসিয়া আনন্দ করিয়া দৃশ্য দেখিতেছি।"

এই প্রকার অনেক কথা হইল, তখন রাত্রি তিনটা, আমি বিশ্রাম করিতে চলিলাম। বেশীক্ষণ আসনে বসিতে পারি নাই। অতি অল্প ক্ষণেই অনেক কথা শুনিলাম। নিকটে পঞ্জিকা না থাকায় একাদশী কবে আমি জানিতাম না। গতবারে সাধুটি যখন বলিলেন "আজ একাদশী; চল গঙ্গা পার হই, মা আগে

আগে গিয়াছেন।" পরদিন পঞ্জিকা দেখিয়া জানিলাম যে, ঠিক সেই সময় সত্যই একাদশী ছিল। সাধুর কথা সত্য হওয়াতে দৃশ্যগুলির উপর আমার কিছু শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু ওটা যে গঙ্গা নদী নয় সে রহস্যটা পরে খুলিয়াছিল।

(৩)

আমার বক্তব্য

উপরি লিখিত পত্রগুলিতে পত্র-লেখকের যে অনুভূতি আলোচিত হইয়াছে তাহা কর্ম্মী যোগীর পরিচিত সাধারণ অনুভূতি। অবশ্য গুরু কৃপা ব্যতীত সকলের মধ্যে এই অনুভূতির উদয় হয় না। এই অনুভূতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রশ্ন পরিহার করিয়া সাধারণ ভাবে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

শব্দ, জ্যোতি এবং রূপ—যোগ-পথে এই তিনটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শব্দ প্রথমে গুরুদত্ত মন্ত্ররূপে অথবা অন্য কোন প্রকারে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহা বস্তুতঃ শব্দমাতৃকা কুণ্ডলিনী-শক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস। গুরু-সঞ্চারিত জাগ্রৎ শক্তির প্রভাবেই হউক, অথবা অন্তরুদ্বুদ্ধ আত্ম-শক্তির প্রভাবেই হউক, শব্দ নাদরূপে সাধকের দেহকে আশ্রয় করিয়া সুষুম্না-মার্গে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে থাকে। এই শব্দ বস্তুতঃ জাগ্রৎ চৈতন্যেরই নামান্তর। প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দ ও জ্যোতিঃ অভিন্ন বস্তু। বাচক অধ্বাতে যাহা শব্দরূপে প্রকট হয় বাচ্য অধ্বাতে উহাই জ্যোতীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শব্দ মায়াবদ্ধ জীবের নিকট বিচ্ছিন্ন বর্ণের সমষ্টিভূত পদ বাক্য প্রভৃতি রূপে

অভিব্যক্ত হয়। এই সকল বিচ্ছিন্ন বর্ণ ভৌতিক আকাশের গুণ স্বরূপ। এইগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া যে পদ ও বাক্য রচনা করে তাহা আমাদের চিন্তাময় মনোভূমির পুষ্টিকারক। অশুদ্ধ বিকল্প-জ্ঞান এই মায়িক শব্দ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে! বিশুদ্ধ নির্ব্বিকল্প জ্ঞান পাইতে হইলে এই চিন্তাময় শব্দ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য বর্ণাত্মক শব্দকে পদ বাক্যাদি রূপে পরিণত না করিয়া বিপরীত ক্রমে ধ্বনিরূপে পরিণত করা আবশ্যক। ইহার ফলে বর্ণাত্মক শব্দ সুষুম্নাবাহী নাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন বৈখরী বাক্ স্বভাবতঃই মধ্যমা বাক্‌রূপে পরিণত হয়। পুনঃ পুনঃ মন্ত্র-জপের ফলে অথবা নিরবচ্ছিন্ন নাম-কীর্ত্তনের প্রভাবে সহজে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর। চক্ষু নিমীলিত করিলে ভিতরে যে অন্ধকার দৃষ্টিগোচর হয় তাহাই অজ্ঞানের অন্ধকার জানিতে হইবে। নাদের ক্রম-বিকাশের ফলে এই অন্ধকার ক্রমশঃ অপসারিত হয়। তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেও ভিতরে স্বচ্ছ প্রকাশ নির্ম্মল শুভ্র আকাশের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নাদের তীব্র শক্তিতে ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় ভিতরের প্রকাশ ভিতরেই অবরুদ্ধ থাকে। বাহিরে তাহার সমাগম হওয়ায় অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে একটি বিরাট্ জ্যোতির্ম্ময় আকাশ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বহির্দৃষ্টির সম্মুখে উহার কোন প্রভাব পড়ে না। বাহ্যজগতে আলো ও অন্ধকার পূর্ব্বের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতে থাকে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতে অনন্ত প্রকাশ খুলিয়া যায়। নাদের ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে কাহারও কাহারও সাময়িক ভাবে ঐ জ্যোতি বাহিরেও ফুটিয়া

উঠে। বস্তুতঃ তখন বাহ্য জগতের সত্তা উহা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঐ সময়ে চারিদিকে অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র বিশাল জ্যোতি প্রসারিত হয়; এই জ্যোতি বস্তুতঃ ঐ নাদেরই স্ফুরণের ফলে দৃষ্টিগোচর হয়।

নাদ হইতে যেমন জ্যোতির অভিব্যক্তি হয় তেমনি জ্যোতি হইতে রূপের অভিব্যক্তি হয়। বস্তুতঃ নাদ হইতে জ্যোতি হয় না, কিন্তু বিন্দুরূপা মহামায়া বা কুণ্ডলিনী ক্ষুব্ধ হইয়া একদিকে নাদরূপে ও অপরদিকে জ্যোতীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। জ্যোতির ঘনীভূত পরিপক্ক অবস্থাতে রূপ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহা এক দেশেই হইয়া থাকে। বিশাল সমুদ্রের ক্ষুদ্র এক প্রান্তে যেমন বরফের পাহাড় রচিত হয় এবং ঐ পাহাড় সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে এক প্রান্তে ভাসমান থাকে, তদ্রূপ বিশাল জ্যোতিঃপুঞ্জের কিছু অংশে রূপ আবির্ভূত হইয়া ঐ জ্যোতি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াই প্রতিভাসমান হয়। তবে দ্রষ্টা যখন ঐ রূপের সহিত ব্যবহার-মূলক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় তখন রূপ স্বাভাবিক প্রতীয়মান হয় এবং ব্যাপক জ্যোতি দেখা যায় না। রূপবান্ দ্রষ্টা ও রূপবান্ দৃশ্য একই স্তরের হইলে জ্যোতির দর্শন থাকে না। নতুবা রূপটি নিম্নভুমির দ্রষ্টার নিকট জ্যোতির্বেষ্টিতরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

রূপ বলিতে শুধু মূর্ত্তি বুঝায় না, যে কোন সাকার দৃশ্য বস্তুই রূপের অন্তর্গত, অর্থাৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় সাকার বিশ্বরূপ শব্দের বাচ্য অর্থ। জ্যোতি ও রূপ অভিন্ন হইলেও জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া উহারই ঘনীভূত অংশ রূপের আকারে অর্থাৎ সাকার

দৃশ্যের আকারে ঐ জ্যোতির মধ্যেই প্রকাশিত হয়। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী মনুষ্য দেব দানব নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র কুঞ্জ প্রভৃতি অনন্ত আকারে জ্যোতিই দৃশ্য ভাব ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। দেশ ও কাল বস্তুতঃ জ্যোতি হইতে ভিন্ন নয় বলিয়া ঐ সময়ে উহারাও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া জ্যোতির মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করে। সেই জন্য সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ সুদূর অতীতের প্রকাশও বর্ত্তমান রূপে ঐ জ্যোতির মধ্যেই হইয়া থাকে। তদ্রূপ বহু দূরের দৃশ্যও সন্নিহিত রূপে উহাতে প্রকাশমান হয়। দেশগত ব্যবধান এক হিসাবে থাকে না, কারণ ব্যবধান-নিবন্ধন দৃশ্যের যে সঙ্কুচিত ভাবে দর্শন স্থূল জগতে ঘটিয়া থাকে ঐ জ্যোতিতে দর্শন কালে সে সঙ্কুচিত ভাব মোটেই থাকে না। সুতরাং দূরত্ব এক হিসাবে থাকে না বলা অসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে যোগীর কর্ম্মগত অপূর্ণতা থাকিলে এই অব্যবধানের মধ্যেও একটা দুর্ভেদ্য আড়াল থাকিয়া যায়। সেইজন্য দৃশ্য বস্তু সুস্পষ্টভাবে অতি সন্নিহিত প্রতীত হইলেও এবং তাহা স্পর্শযোগ্য হইলেও দ্রষ্টা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যেমন সম্মুখে দৃষ্ট হইলেও তাহাকে স্পর্শ করা যায় না তদ্রূপ ঐ দৃশ্যও সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইলেও উহা স্পর্শের অগোচর। কর্ম্ম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন ও স্পর্শন যুগপৎ হইতে পারে না। অপূর্ণ কর্ম্ম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই রূপই ঘটিয়া থাকে।

শুষ্ক জ্ঞান ও দিব্য জ্ঞানের সম্বন্ধে আমি স্থানান্তরে আলোচনা করিব। সংক্ষেপে এখানে ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে শুষ্ক-জ্ঞানের প্রভাবে নিষ্ক্রিয় স্থিতি জন্মে, কিন্তু জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার

যোগ থাকিলে ঐ শুষ্ক জ্ঞান আর শুষ্ক জ্ঞান থাকে না, উহা দিব্য জ্ঞানে পরিণত হয়। শুষ্ক জ্ঞানে বৈচিত্র্য দর্শন হয় না, কিন্তু অখণ্ড জ্যোতিতে স্থিতি হয়। ঐ জ্যোতির অন্তর্নিহিত অনন্ত বৈচিত্র্য যে ফুটে না জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধের অভাবই উহার একমাত্র কারণ, তাই ঐ জ্ঞান জ্ঞান-শক্তি নহে। জ্ঞান-শক্তির সহিত ক্রিয়া-শক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই জ্ঞান অনন্ত দূর-প্রসারিত জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হইলেও ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ দেশগত ও কালগত ব্যবধান ক্রিয়ার পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইয়া যায়। তখন জ্ঞান ও ক্রিয়া সম-সূত্রে অভিন্ন হয় বলিয়া প্রাপ্তিও পূর্ণভাবে ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে দিব্যজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

মা ও গুরু স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও মাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া গুরুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কৃপা এবং কৃপাশূন্য পুরুষকার, উভয় পথে পার্থক্য থাকিলেও এই অংশে সাদৃশ্য আছে। তবে কৃপাপথে মা পথ-প্রদর্শিকা রূপে অগ্রগমন করেন এবং কৃপাশূন্য পথে মা সন্তানের অনুগমন করেন। তিনি পশ্চাতে থাকিয়া সন্তানকে রক্ষা করিতে করিতে গুরুর নিকট উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সন্তানের অনুগমন করেন। উভয় পথেই পর্য্যবসানে মা ও সন্তান অভিন্ন হইয়া গুরুতে আত্ম-সমর্পণ করেন। তখন গুরুর মহাকৃপার সঞ্চার হইলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, যাহার ফলে গুরু আর গুরু থাকেন না। একমাত্র আত্মাই তখন পরম স্বরূপে অখণ্ড সত্তা লইয়া বিরাজ করে। ইহা

সন্তানের অর্থাৎ যোগীর নিজ স্বরূপ, ইহা মায়ের নিজ স্বরূপ এবং ইহা গুরুরও নিজ স্বরূপ—ইহারই নাম স্বয়ং রূপ।

পত্র-লেখক মাতৃ-ভূমি হইতে গুরু স্থানে যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে যে দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহাতে বলিবার কিছুই নাই, কারণ তাহা সত্য। ইহা খুবই সত্য যে গুরুর জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জাগিলে যে কোন স্থিতিতেই গুরু-দর্শন হইতে পারে। তবে নিজের যোগ্যতা অর্জ্জিত না হইলে গুরুর স্বরূপে স্থিতিলাভ সুকঠিন! মায়ের রাজ্যে আনন্দময় স্বরূপে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলে মায়ের কৃপায় অন্তরের পুষ্টি ও বলাধান সম্পন্ন হয় বলিয়া মাতৃ-ভূমি হইতে গুরু-ভূমিতে মাই অগ্রগতি ঘটাইয়া দেন। তবে ইহাও সত্য যে আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলে ঐ আনন্দ-ভূমিতেই সুদীর্ঘ কাল আবদ্ধ হইয়া থাকার আশঙ্কা রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে ইহাও এক প্রকার মোহ। ইহা কাটাইতে না পারিলে চিরচৈতন্যময় গুরু-ভূমিতে জাগরণ ঘটে না।

পত্র-লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—শব্দের অনুসরণ ও জ্যোতির অনুসরণ এই উভয়ের মধ্যে ফলগত তারতম্য আছে কিনা। ইহার একদিক্ হইতে সমাধান তিনি নিজেই করিয়াছেন। জ্যোতির অনুসরণ করিতে করিতে রূপময় দৃশ্য জগৎ ফুটিয়া উঠে। ইহার মূলে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইচ্ছাশক্তির খেলা রহিয়াছে, কারণ ইচ্ছা-বিবর্জ্জিত হইয়া পরম জ্যোতিতে প্রবেশ করিলে সেখান হইতে আর ব্যুত্থান হয় না। তাই রূপময় দৃশ্য জগৎ ফুটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে

৯

জ্যোতিতে স্থিতি হয় না, অর্থাৎ স্থিতির মধ্যেও গতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই গতির ফলে স্তরের পর স্তর ভাসিয়া উঠে এবং সেই সকল অতিক্রম করিয়া মাহানুগ্রহের ফলে পূর্ণ স্বরূপে অধিরূঢ় হওয়া সম্ভবপর হয়। লীলার মূল ইচ্ছা, তাই ইচ্ছা বীজ-রূপে থাকিলে জ্যোতির মধ্য হইতে রূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে। পক্ষান্তরে শব্দকে অনুসরণ কারিলে এবং জ্যোতির দিকে লক্ষ্য না দিলে ঐ শব্দ ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াই হউক অথবা ক্ষীণ হইয়াই হউক, শব্দাতীত পরব্যোমে লীন হইয়া যায়। ইহা আনন্দের পরিপূর্ণ স্বরূপ, যে আনন্দে লীলারস না থাকিলেও মহাশান্তির স্নিগ্ধ ও সুশীতল প্রভাব অনুভূত হয়। তবে ইহা সত্য যে পূর্ণ বিকাশের ফলে শেষে দুইটি ধারাই এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

পত্র-লেখক যে "হরিদ্বারের সাধুর" কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি একজন অলৌকিক মহাপুরুষ। লছমনঝোলা হইতেও কিঞ্চিৎ উত্তরে মহানিশার সময়ে গঙ্গাবক্ষে লেখক উঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। উঁহার সঙ্গে পত্র-লেখকের বহু বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। কিন্তু এখানে উঁহার চর্চ্চা অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

জীবন সমস্যা সমাধান — শ্রীশ্রীগুরু

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইং ১৯১২ সালে যখন কাপালিকেরা আমাকে বলি দিবার জন্য বিন্ধ্যাচলে লইয়া যায় তখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই রক্ষা পাই। কিন্তু তাহা তখন জানিতাম না—জানিতে পারিলাম অনেক পরে। সে সমস্ত বিস্তারিত ঘটনা সম্ভবপর হইলে বারান্তরে উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। এখন আমার আন্তরিক বেগ ও ক্রন্দনের রোল স্মরণপথে উদয় হইতেছে। সে সময় মুক্ত হইবার পর বুকের মধ্যে কি যেন আলোড়ন করিত, মোচড় দিত, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া খান খান করিয়া বিচ্ছুরিত হইতে চাহিত, কিন্তু পারিত না। তাই কি এত ক্রন্দন?

কি যেন ছিল,—কি যেন হারাইয়াছি! জানি না কি খুঁজিতেছি! পাই নাই বলিয়া কি এত ক্রন্দন!

কি যেন একটা অজানা আসন্ন বিপদ সদা সর্ব্বদা হুঙ্কার দিতেছে, প্রাণ ভয়-ভীত, তাই কি এত ক্রন্দন!

নীরব ক্রন্দন কেন? ক্রন্দনের শব্দ কোথায়? অশ্রু কোথায়? চোখে জল নাই কেন? জল থাকিলে যেন শান্তি পাইতাম। জল নাই বলিয়া কি এত ক্রন্দন!

রুদ্ধ-অশ্রু বুক-ফাটা আকুল ক্রন্দন কি এই? এত হাহাকার কেন? কাকে পাবার জন্য এত ক্রন্দন? কি করিব? কি করিলে এই ক্রন্দনের শান্তি হয়? এটা কি সত্যই ক্রন্দন?

না অন্য কিছু ? যদি ঠিক ক্রন্দনই হইত তাহা হইলে ঈপ্সিত ধনকে তৎক্ষণাৎ পাইতাম, আমার হারাধনকে বুকে করিয়া জড়াইয়া রাখিতাম ! কি চান বলিতে পারি না। যদি সত্যই বলিতে পারিতাম তাহা হইলে হয়ত এত জ্বালা সহিতে হইত না। তা ত জানি না। কেহ বলিয়া দিবে কি ? আমার গভীর অন্ধকারে কে প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে ? কে বলিয়া দিবে আমি কাহাকে হারাইয়াছি আর কাহাক পাইলে আমার জীবন-সমস্যার সমাধান হইতে পারে ?

সাধু ও কাপালিকের দল হইতে মুক্তি পাইয়া চারিদিক্ ঘুরিতেছি এমন সময় একদিন বৈকালে দেখি আমার একটি সহপাঠী গীতা হাতে করিয়া হন হন করিয়া কোন গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু সে কিছু বলিতে চাহিল না। আমি তার পিছু ধরিলাম, সে নিরুপায় হইয়া আমাকে লইয়া চলিল। একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া একটি ক্ষুদ্র মাঠে গিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম যে আজ ওখানে একটি মরাল ক্লাস হইবে, সেখানে ছোট ছোট বক্তৃতা ও গীতা পাঠ হইবে। গীতার কথায় আমাকে আকৃষ্ট করিল, অথচ গীতা যে কি তা জানি না।

একজন সদস্য 'স্বামীজী বলিতেন' বলিয়া ইংরাজীতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"True religion will give us faith in ourselves, a national self-respect and the power to feed and educate the poor and relieve the misery around us. If you want to find

God, serve man ! এই lecture শুনিয়া পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। হাঁসপাতালে ও রাম-কৃষ্ণ আশ্রমে কত লোক রোগীর সেবা করিতেছে, কই তাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিলাম না যে আত্মোন্নতির বিষয় আলোচনা করিতেছে। কোথাও সাড়া নাই, অনুভূতি নাই। আজ দ্বিতীয় একটি বিবেকানন্দের সৃষ্টি হইতেছে না কেন ? স্বয়ং বিবেকানন্দ কয়জনের সেবা করিয়া তাহাদের দুঃখ ঘুচাইতে পারিয়াছিলেন ? কি ভাবে সেবা করিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে এই কৌতুহল মিটাইবার জন্য তাঁহার রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া নিরাশ হইয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলাম, এই লইয়াই কি বেশ পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করা চলে ? অবশেষে বুঝিলাম যে ধর্ম্ম-আলোচনা মুখ্য নয়, ইহার পশ্চাতে আর কিছু গুপ্ত ব্যাপার আছে। সেটা হইল রাজনৈতিক বিপ্লব-দল সৃষ্টি করা।

আমি মাতিয়া গেলাম, ** দা ও ** দাকে পাইয়া মনে হইল যেন দ্বিতীয় স্বামীজী পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দেশের কাজে জুটিয়া গেলাম,—সেবা-সমিতির কাজ কাশীতে খুব জোরে চলিতে লাগিল। মনে হইল যেন শীঘ্র ভারত স্বাধীন হইয়া যাইবে, আর দেশের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। যদি মানুষের দুঃখ এই ভাবে কাজ করিলে ঘুচিয়া যাইত তাহা হইলে এত দিনে কত লোকের দুঃখ ঘুচিয়া যাইত। এই কি প্রকৃত সেবা ? দুঃখ যে কাহারও ঘুচিয়াছে তাহা ত মনে হয় না। সেই দুঃখ কি করিয়া ঘোচে ? তাহার প্রকৃত উপায় জানা চাই। কেবল রোগের ঔষধ

দিলেই দুঃখ ঘোচে না। দুঃখ ঘোচাবার শক্তি কোথায় ? নিজের দুঃখ যার ঘোচে নাই, সে পরের দুঃখ কি করিয়া ঘুচাইবে ? প্রথমে কেহ নিজের দুঃখ ঘুচাইতে পারিলে তবে সে পরের দুঃখ কিছু অনুভব করিতে পারে, তাহাও কাল্পনিক, তবে কিছু ঘুচাইবার পথ বলিতে পারে, এমন কি নিজের শক্তি-বলে অপরের দুঃখ সাময়িক ভাবে ঘুচাইতে সক্ষম হয়। কাহারও রোগের কষ্ট হইলে মানুষ কি তার ব্যথা এতটুকু অনুভব করিতে পারে ? যার এতটুকু পরের দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি নাই, সে তার বিরাট্ দুঃখের বোঝা কি করিয়া সরাইবে ? বাতুলতা নয় কি ? ভ্রম ! কেবল ভ্রম ! সামান্য ঔষধ দিয়া, অর্থ দান করিয়া, লোকে মনে করে যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হইয়া গেল। এ প্রকার সেবা কোন না কোন আকারে হাজার হাজার বৎসর অবধি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্তর্দাহ, মর্ম্মান্তিক ব্যথা এতটুকু কমে নাই, বরং দিনের পর দিন বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে।

এখন প্রকৃত শিক্ষা চাই। আসল বস্তু পাওয়ার দিকে কতটা অগ্রসর হইলাম, তাহা ভাবিয়াছি কি ? কত লোকে অশিক্ষায় জীবনে কত দুঃখ পায়, আবার কেহ অশিক্ষায়ও না জানি কি পাইয়া কত আনন্দে থাকে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—সেই আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া না পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। এইটাই হইল কষ্টিপাথর। এইটা দেখে বোঝা যায়, কে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত।

সেই আসল বস্তুটি কি ? তাহার কোনও অস্তিত্ব আছে কি ? জগতে কেহ উহা পেয়েছে কি ? যদি থাকে তো কি করিয়া

উহা পাওয়া যায়? ইহাই মুখ্য প্রশ্ন। কেবল ফাঁকা কথার উপর জীবনটা ফেলিয়া দেওয়া যায় না। সব ছাড়িয়া তার পিছনে ছুটিতে তখন পারা যায়—যখন তার সাড়া এতটুকু পাওয়া যায়।

যখন আসল বস্তু থাকা আর না থাকার প্রশ্ন উঠিতেছে তখন পাবার কথা তো উঠিতেই পারে না। প্রথমে ভাল করিয়া বিচার করিয়া জানা চাই, কিছু আছে কি না—আছে বলিয়া বিশ্বাস হওয়া চাই—তখন পাওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে। যদি না থাকে তো খুঁজিবার চেষ্টা ত হইতেই পারে না। আর যদি থাকে তো প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিয়া খুঁজিতে, সাধন করিতে, তপস্যা করিতে প্রেরণা আসিবে। "কি করিয়া খুঁজিতে হয়" এইটুকু জানাকেই শিক্ষা বলে। এই প্রকার-শিক্ষা প্রাপ্তির উপায় কে বলিয়া দিবে? কোন পুস্তকে ইহা আছে কি? কোনও সাধু কোথাও আছেন কি যিনি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন? এ বিষয়ের মীমাংসা ওখানে পাইলাম না—পাওয়ার মধ্যে ঝড়-ঝাপ্টার তরঙ্গ আসিয়া তোলপাড় করিয়া গেল।

তারপর জেলে ও অন্তরীণ অবস্থায় পাঁচ হইতে ছয় বৎসর কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মন-মরিয়া হইয়া নির্জ্জনে ও নিভৃতে সময় কাটাইতে লাগিলাম। এমন সময় * * * এর সহিত দেখা—তাঁহাকে মনের কথা বলিয়া বুকটা যেন হাল্কা হইল। আমেরিকা যাইয়া কিছু শিক্ষা করিব ভাবিতেছিলাম—তার জন্য কিছু lecture সংগ্রহ করিতে হইবে এবং পাথেয়ও প্রয়োজন। যোগ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও সব

বিষয় আমার কাছে কিছু পাবে না। গোপীদার কাছে যাও। তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।"

দাদাকে কাশীতে গঙ্গা-তটে পাইলাম। তিনি যেন আমার মনের কথা অবগত হইয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁর বাণীর প্রস্রবণ যেন আমার অন্তরের সমস্ত প্রশ্নের একাধারে উত্তর --শুনিতে লাগিলাম, এতটুকু প্রশ্ন করিবার অবকাশ নাই। কেবল অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। খুঁজিবার এই চেষ্টাকে যে জাগিয়ে দিতে পারে সেই ত প্রকৃত গুরু। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাকে কি করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়? এই দেখিবার শক্তিকে যে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে সেই ত প্রকৃত গুরু। অন্ধকারকে সরাইতে হইলে কেবল আলোটুকুর প্রয়োজন, সেই আলোটুকু যিনি কৃপা করিয়া প্রদান করেন তিনিই প্রকৃত গুরু। এই আলো কি করিয়া আসে? তার জন্য কি করিতে হইবে? সত্যিকার চাওয়া কাহাকে বলে? যাহাকে না পাইলে এক দণ্ড চলে না, প্রাণ কেমন-কেমন করে; সর্ব্বদাই মনে হয় যেন কাহাকে চাই, না পাইলে চলিবেই না, পেতেই হইবে— এইরূপ দৃঢ়তা যখন প্রকাশ হয় তখনই পাইবার সময় হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু আমার মনে হইল যে তখনও আমার পাওয়ার সময় হয় নাই। যখন পাইবার সময় হয় তার ব্যস্ততা ব্যাকুলতা যতই বাড়ে ততই নিকট হইতে থাকে। নিজের ব্যাকুলতার পরিমাণ ও প্রগাঢ়তা অনুভব করিতে পারিলাম না। যখন কিছুই পাই না তখন আমার ব্যাকুলতার মূল্য কতটুকু? এই সব কথা মনে মনে ভাবিতেছি তার উত্তরে দাদা নিজের বাণীর মধ্য দিয়া

বলিলেন, "তোমার মধ্যে এমন কোনও শক্তি নেই যে তুমি নিজের চেষ্টায় গুরু লাভ করিতে পার। যখন সময় হইবে তখন গুরু নিজেই দর্শন দিবেন, যেমন ফুল ফুটিলে ভ্রমর মধু লইতে আপনি আসে, কিন্তু ফুল মধু দিতে ভ্রমরের নিকট যায় না। কেবল কি করিয়া নিজেকে ফুটাইতে হইবে, কি করিয়া ফুটাইতে হয়, তাহাই জানা চাই। মনকে ঐভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া উহাকে আত্মস্থ করিতে হইবে।" দাদার বাণী শুনিতে শুনিতে আমি এত দিন পর কাহাকে আত্মস্থ হওয়া বলে তাহা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। এবার সময়ের প্রতীক্ষা। কবে সে দিন হইবে ? সে মাহেন্দ্র সুযোগ কবে হইবে ? তারপর তাঁহার সান্ত্বনা পাইতে লাগিলাম, কিন্তু সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে আমার মনে আরও হাহাকার পড়িয়া গেল।

দাদার বাণীর মধ্যে গুরু-লাভের লোভ ও আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "৺পুরীধামে শ্রীগুরুদেব আছেন, তাঁর দর্শন পাইতে হইলে ও কৃপা লাভ করিবার মত নিজে উপযুক্ত হইতে হইলে এখন হইতে কিছু নিয়ম অভ্যাস কর। তারপর ক্রমশঃ সব ঠিক হইয়া যাইবে।" গুরু-লাভের যে কত অন্তরায় আসিয়া পড়িতেছে সে কথা তখনও দাদাকে বলি নাই। ভয় ছিল পাছে দাদা নিজেও অন্তরায় না হইয়া পড়েন। কারণ তিনিও বিবাহিত ও সাংসারিক। তিনি হয়ত আমাকেও নিশ্চয়ই বিবাহ করিতে আদেশ করিবেন, যাহা আমি পালন করিতে পারিব না। তাই ভাবিলাম ইহা গুরুজনকে জিজ্ঞাসা করাই অনুচিত। জিজ্ঞাসা করলে তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করণীয়।

আমার অন্তরীণ অবস্থায় বিবাহ সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত অতি তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছিলাম। আমি যখন জেলে, তখন আত্মীয় স্বজন, পিতা-মাতা সকলেরই একে একে তিরোধান হইয়াছে, কেহই আমাকে আশ্রয় দিবার নাই। আমি যেখানে বন্দী ছিলাম সেখানে বেশীর ভাগ বাদশাহদের পরিবার বাস করিতেন। ধনী ও শিক্ষিত সমাজ আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশ অগ্রসর, ইংরাজের রাজত্বে তাঁহারাই দক্ষিণ হস্ত, সেই জন্য তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি সহজেই সরকারের নিকট হইতে লাভ করিতেন। দলে দলে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তার মধ্যে এক জন ফকীর সাধুর দর্শন লাভ হইল। তিনি উর্দ্দু ভাষায় আমাকে অনেক শুনাইতে লাগিলেন, যোগ সম্বন্ধে তাঁর বেশ গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না, আমাকে লইয়া পদ্মাসনে বসাইয়া হিন্দুর মূল শিক্ষা বুঝাইতেন। আমি ভাবিতাম মুসলমান হইয়া হিন্দুশাস্ত্র-জ্ঞান কোথা হইতে পাইলেন। কয়েক দিন পর তিনি বলিলেন "দেখ এই গভীর নিশীথে কত দেবতারা আকাশ-মার্গে যাওয়া আসা করেন, তাঁহারা দুঃখী ও ভক্ত জীবকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কতই ব্যস্ত। তোমরা এমন দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে আহার-নিদ্রায় অবহেলায় ব্যয় করিতেছ।" যাহা হউক, তাঁর সংস্রবে আমার মন বেশ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি একাধারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ট, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের সমন্বয় সুন্দর ভাবে আমাকে বুঝাইতেন। মুসলমান ফকীর সাধুটির সহিত আমার বিশেষ ভাব হইবার কারণ ছিল, তিনি বিবাহ-বিরুদ্ধ ছিলেন। আমি বিবাহ

করি নাই বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া একটি আশ্রম গঠন করিবেন স্থির করিলেন, তার জন্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন।

এ দিকে একটি হিন্দু কন্যা সদ্‌বংশীয়া পরমা সুন্দরী—তাহার বিবাহের জন্য লোকে নানা কথা আমার কর্ণ-কুহরে ঢালিতে লাগিল। আমি অতি নির্ব্বিকারে হঁা হঁা করিয়া সকলকে বিদায় করিতাম, কত করিয়া বুঝাইতাম যে আমার এমন অবস্থা নয় যে বিবাহের কথা ভাবিতে পারি। কে কাহার কথা শুনে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাহারা কন্যাদায় গ্রস্ত, কোন মতে কন্যা দিতে পারিলেই যেন নিষ্কৃতি। অবশেষে ব্যাপার এতটা অগ্রসর হইল যে ম্যাজিষ্ট্রেট এর অনুমতি লইয়া মেয়ের মা ও বাপ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি আরও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। একটি সাধু বা জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে নয় দিন অনুষ্ঠান করা হউক (একপায় দাঁড়াইয়া)—নয় দিন পরে বিবাহ হইবে। "Fasting till death" ইত্যাদি বলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্মতি দান করিয়াছেন আমাকে এই কথা বলা হয়। আমি পলাইবার ব্যবস্থা করিলাম,—"বিবাহ করিব না" বলিয়া পলাইলাম। পালইয়া ভাবিয়াছিলাম বেশ নিষ্কৃতি পাইলাম।

কিন্তু সেখান হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ীতে আসিয়া কিছুদিন পরেই দেখি যে এখানেও বিবাহের কথা চুপি চুপি চলিতেছে। সকলেই মনে করিত যে কোন রকম কিছু ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাই এখন পলাইতে চায়। এই বলিয়া তাহারা আমাকে চাপ দিবার চেষ্টা করিত। দেখিয়া আমি আরও বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করিলাম।

এইরূপ আলোচনা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। কাশীতে ঔপন্যাসিক শরৎবাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমার বিরুদ্ধ ভাব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

অবশেষে দাদা আমাকে লইয়া ৺পুরীধামে তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমে গেলেন। সেখানে বাবা অতি মধুরভাবে আমাকে বলিলেন, "দেখ, বিবাহ তো আমিও করিয়াছি, বিবাহ করিলেই কি কোনও ব্যাঘাত হয়? বরং যোগ সুসম্পন্ন হয়", ইত্যাদি। অনেক কথা বলিলেন। 'বিবাহ হইলেই আমার মৃত্যু হইবে এই প্রকার ঠিকুজীতে আছে ও একজন সাধুও বলিয়াছেন', ইহা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "তার জন্য আমি দায়ী, সে বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মৃত্যু-গ্রহ খণ্ডন করিয়া দিব, আমার সাক্ষাতে মৃত্যু তোমার হইতেই পারিবে না।" এত জোর করিয়া বলিবার মত শক্তি অন্য কোনও সাধুর দেখি নাই। আমি কেবল অবাক্ হইয়া শুনিতাম ও তাঁহার কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতাম। মৃত বোলতা প্রভৃতিকে জীবন দান করিতেন, মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দিবার মত ক্ষমতা যে ইঁহার আছে তার অনেক প্রমাণ পাইলাম।

আমার সঙ্গে একটি আমেরিকা-ফেরত বাঙ্গালী বাবু ছিলেন, বেশ ধনী ও শিক্ষিত লোক। তিনি বাবার অনন্য ভক্ত ছিলেন। খুব বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি বাবার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ মর্দ্দন করিয়া মেসাজ করিয়া দিতেন, তাহাতে বাবা বড়ই সুস্থ বোধ করিতেন। তিনি বলিতেন, বাবার শরীরের মধ্যে কি যেন পাথর ভরা আছে। একবার টিপিতে টিপিতে দুই তিন সের খুব চক্‌চকে ও খুব ঠাণ্ডা পাথর শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাবা মাত্র দেড় ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। তখন রাত্রি নয়টা হইবে, বাবা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। উনি কাঁদ-কাঁদ হইয়া আমাকে বলিলেন, "কি হইবে? বাবা উঠিয়া না জানি কতই রুষ্ট হইবেন।" অন্ধকারে স্ফটিকগুলির মধ্য হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা নিদ্রা যাইবার পর বাবা জাগ্রৎ হইলেন। উঠিয়াই বলিলেন, "কিগো, কাঁদিতেছ কেন? কাঁদিবার কি আছে? একটু আরাম পাইয়া অসাবধান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তোমাদের দোষ কি। সুরেন্দ্র, লণ্ঠনটা আন তো।" আমি লণ্ঠন লইয়া আসিলাম, দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল ফাঁক করিলেন আর বলিলেন, "ওইগুলি ভরিয়া দাও।" বাঙ্গালীবাবু ওইগুলি মুঠি মুঠি করিয়া তুলিয়া ভরিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন কোথায় তলাইয়া গেল। এতগুলো পাথর ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ঢুকিয়া এই শরীরে কি করিয়া থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়াই তিনি আকুল। আমাদের শরীরে একটি ক্ষুদ্র কণ্টক ফুটিলে কতই যন্ত্রণা হয়। হায়! কেবল এই পাথর প্রবেশ করাইবার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিতেছেন। বস্তুতঃ এই বিরাট্ অট্টালিকা ক্ষণেকের মধ্যে প্রবেশ করাইলেও তাঁহার শরীরের এতটুকু বিকৃতি হইবে না। বড় যোগী চন্দ্র সূর্য্যকে নিজের মধ্যে লইতে পারেন, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই।

যাহা হউক, আমরা কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বাবার আসার পর আমার বিবাহের কথা লইয়া ঘোর আলোচনা হইতে লাগিল।

বন্ধু বান্ধব বড় বড় সাহিত্যিকমণ্ডল এবং বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ লেখক শরৎবাবু প্রত্যহ আমার নিকট গল্প শ্রবণ করিবার আশায় আসিতে লাগিলেন। তার মধ্যে বিপ্লবদলের লোকেরা ও ছেলেদের দল ও গুপ্তভাবে আসা যাওয়া আরম্ভ করিতে লাগিল। আমি গুপ্ত দলের কার্য্য যাহাতে ত্যাগ না করি তাহার জন্য অনেকে অনুরোধ-পত্র লইয়া আসিতে লাগিলেন। সেই জন্য আমাকে দেখা কয়া বিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধক রচনা করিতে হইয়াছিল। কার্ড না দিলে সাক্ষাৎ করিতাম না। একবার শিবপুরে শরৎ-বাবুকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কাশীর সুরেনকে চেনেন?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। যে কার্ড না হলে দেখা করিত না—আমাকেও কার্ড দিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। আমি জীবনে বাঙ্গালীর ঘরে, এমন কি রবি ঠাকুরের বাড়ীতেও, কখনও কার্ড দিয়া দেখা করিতে যাই নাই", ইত্যাদি। লোকটি একটু অপ্রস্তুত হইল দেখিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমি জানি সে সময় বড়ই বিব্রত হইয়া এই ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হইয়াছিল। পুলিশের তাড়নায় তাহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। পুলিশের গুপ্তচরের জন্য এই কার্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল। জানি তাতে লজ্জা পাইবার কিছু নাই। বিশেষ করিয়া বিবাহের জন্য যে সব লোকেরা আসিতেন তাহাতে সে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। বিবাহের কথায় অনেকে কত প্রসন্ন হয়। আমি জীবনে এই একটি লোক দেখিলাম যে বিবাহের বিরুদ্ধে প্রাণটাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছিল। মশায়, বলিব কি বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গভীর রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ

দেয়, পিস্তল লইয়া গুলি দ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করে। অন্তর হইতে বিবাহের প্রতি বিতৃষ্ণা ভয় ও উৎকণ্ঠা আমার জীবনে এত বেশী আর কোথাও দেখি নাই। কাশীতে সাধু দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল। অনেকে অনেক রকম সাধু দর্শন করাইলেন বটে, কিন্তু তৃপ্ত হইলাম না। সুরেন যে কয়টি সাধু দর্শন করাইল তাঁহারা প্রকৃতই দর্শনের যোগ্য। তাহার সাধু দেখিবার ও দেখাইবার চোখ আছে। অবশ্য অনেক বিষয় গুপ্ত রাখিতে বলিয়াছে, তাহা গুপ্ত রাখিয়াছি ও রাখিব। সে আমাকে বার বার বলিত, 'চাটুয্যে মশায়, অনেক কথা আপনাকে বলিতে আমার ভয় হয়, সঙ্কোচও হয়, পাছে আপনি পুস্তকে প্রকাশ করেন।' সকলেই চায় নিজের কথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হউক, কিন্তু তাহার মধ্যে দেখিলাম যে অন্তর হইতে সে চায় না যে আমি তার কোনও কথা প্রকাশ করি।"

কাশীতে শরৎবাবু একদিন 'বড়দিদি' খুলিয়া পড়িয়া বলিলেন, "তোমার নাম আমি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছি, তোমার প্রকৃত রূপ আমি অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আজ প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহা আরও আশ্চর্য্য। তোমার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য কয়েকজন মেয়ে তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত? এত সাধু দর্শন করিয়াও তুমি তৃপ্ত নও। প্রকৃত সাধুর দর্শন এখনও আমার হয় নাই। আশা আছে হবে। যোগী হইতে হইলে যোগীর আশ্রয় লইতে হইবে। এখন যোগীর অন্বেষণ করিতে হইবে। এরূপ যোগী কোথায় এবং কি করিয়া তাঁহার দর্শন হয়? কোনও সাধুর ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে কিনা

তাহা কি কি লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হইবে ? সে জ্ঞান তো আমার নাই।" আমি বলিলাম, "এই জগতে ভগবান্ আছেন তারই বা প্রমাণ কি ? তিনি না থাকিলে এই বিরাট্ বিশ্ব কে সৃষ্টি করিল ? কোন সাধু যদি তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন তো নিশ্চয়ই তাঁহারও সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকিবে। এই সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা চালাকী, ন্যাকামী, হাব-ভাব বা নকল ভক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করা যায় না। প্রকৃত ভক্ত একমাত্র যোগীই হইতে পারেন। কেবল শাস্ত্র পড়িলেই যোগী হয় না।" শরৎবাবু বলিলেন, "এ প্রকার যোগী আছেন কি ? দর্শন পাইবার আশা আছে কি ? চিরকাল মেয়েমানুষ ও পুরুষ মানুষের চরিত্র বিচার করিলাম, কিন্তু প্রকৃত যোগীর খোঁজ করিলাম না। যে কয়জন সাধু তুমি দর্শন করাইলে তাহার মধ্যে একজনকে (ব্রহ্মানন্দ) অতি অদ্ভুত দেখিলাম—তিনি একজন অসীম শক্তিশালী যোগীর বিষয় বলিলেন। এই পৃথিবীর দুঃখ ঘুচাইবার ক্ষমতা একমাত্র যোগীরই আছে। তাঁহারা যে কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত তাহা সাধারণ মানুষ বুঝিতে অক্ষম। এই যোগী এই ভারতেই আছেন, আর কাশী সহরে আসিয়া থাকেন—ঠিক সাধারণ মনুষ্যের মত প্রচ্ছন্নভাবে নিজের কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছেন। এত বড় সাধুকে দর্শন করিবার মত ভাগ্য হইবে কি ?" শরৎবাবুর তো মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়াই পাগল। বলিলেন, "ইহাকে আমি গুরু করিব, ইহাকে লইয়া আমি শিবপুর যাইব।" আমি বলিলাম, "উনি অতি গুপ্ত সাধক, শিষ্য করেন না, বলেন, 'প্রত্যেকের গুরু আছেন, সকলেই গুরুর আশ্রয়ে আছেন, কোনও জীব বিনা আশ্রয়ে এক

দণ্ড জীবিত থাকিতে পারে না—এত শত্রু দ্বারা বেষ্টিত যে তাদের কবল হইতে মানুষ রক্ষা পাইতে পারে না, গুরু সর্ব্বদা নিজ শক্তি বলে তাহাদের অলক্ষ্যে রক্ষা করিতেছেন। সময় হইলে দয়া করিয়া দর্শন দেন, সেই সুসময় ও মাহেন্দ্রযোগ জীবনে যখন হইবে তখন মানুষ ধন্য হইবে।"

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার কিছুদিন পূর্ব্বে ৺পুরীধাম হইতে শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতায় আসিলেন। এবার কাশীতে আসিতেছেন। আমরা গভীর প্রতীক্ষায় রহিলাম। একদিন মোগলসরাই ষ্টেশনে দাদার সহিত গিয়া বাবাকে কাশীতে লইয়া আসিলাম। বাবা তখন কাশীতে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের আশ্রমে উঠিতেন। আমাদের কি উল্লাস, কত আনন্দ! প্রত্যেক দিন বাবার নিকট না গেলে প্রাণ কেমন করিত, কতই আপন, কতই অন্তরের জিনিষ—এ রকম ভালবাসার স্থান যেন কোথায় ছিল, আজ এতদিন পরে সেই হারানিধিকে পাইলাম। কিন্তু আমার সুখের মধ্যে আবার ব্যাঘাত,—আশঙ্কাটা হইত আবার হারাইব কি? আবার পলাইতে হইবে কি? বিবাহের বিষয় লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত তাঁহারা কোনও পথ যখন পাইলেন না, তখন বাবার দ্বারা আমাকে দাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মেয়ের ভাইয়ের সহিত মেয়ে নিজে বাবার নিকট উপস্থিত হইল। বাবা মেয়ের ক্রন্দনে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বিবাহ হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব বিবাহ যাহা জেলে হইয়াছে তাহা বিধিজনক স্বীকার করা যায় না, কারণ ও-প্রকার বিবাহ গ্রাহ্য করা যায় না। বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হওয়া উচিত। সুরেন মনে প্রাণে উহা গ্রহণ করে নাই।"

এদিকে আমি দেখিলাম যে বিবাহ অনিবার্য্য। তবুও চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে যদি দীক্ষা পাইয়া যাই বাবার দেওয়া মন্ত্রটি লইয়া বিন্ধ্যাচলে গিয়া লুকাইয়া থাকা যাইবে। কয়েক দিন পর শুনিলাম যে বাবা নাকি বলিয়াছেন, বিবাহ না হইলে দীক্ষা দিবেন না। আমার তখন বড় দুঃখ হইল—কি করি, দীক্ষা না লইয়া কেবল শূন্য বক্ষে তো চিরদিন ঘুরিলাম, এবার কিছু পাথেয় না পাইলে কি লইয়া থাকিব? ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "যতদিন দীক্ষা না হইতেছে, ততদিন মানুষ শুষ্ক পত্রসম—যেমন বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্র বায়ুতে উড়িয়া বেড়ায়, তোমার সেই অবস্থা। যাঁহাকে গুরু করিতেছ, তাঁহার আদেশ পালনে এত ভয়—ছিঃ, আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা করিলে না?" দাদা খুব বেশী বিবাহ করিতে জোর দিতেন না, তাই তাঁহার নিকটেই থাকিতাম। তবে বলিতেন, "গুরু-আজ্ঞা সদা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য। অন্তর হইতে তাঁহার আদেশ পালনে তৎপর থাকিতে হয়। তাঁহার আদেশ-পালনে দ্বিধাশূন্য হইতে হইবে, তাঁহার আদেশ-পালনে আনন্দ পাইবে—Obedience is love—learn to obey."

বিবাহ সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা বাবার সহিত হইতেছিল। তখন লজ্জা হইবার বয়স ছিল, এখন ত আর লজ্জা নাই। যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা বাবা আমাকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। কাপালিকেরা যখন আমাকে বিন্ধ্যাচলে বলি দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন আমাকে তাহারা impotent হইতে বলিয়াছিল। আমি রাজী হইলে একটি

অণ্ডকোষ অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছিল, ইহা লজ্জায় কাহাকেও বলি নাই। বাবা অন্তর্য্যামী, তিনি বলিলেন, "সুরেন্দ্র, তুমি যোগী হইতে চলিয়াছ। যোগীর অঙ্গহীন হইয়া থাকা উচিত নয়। তোমার কোষ আমি ঠিক করিয়া দিব", ইত্যাদি। অনেক গুপ্ত কথা হইয়াছিল তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

আপাততঃ বিবাহ রহস্য—উদ্‌ঘাটন করি—বাবার আদেশ অনুযায়ী বিবাহের ব্যবস্থা হইল কাশীতে আমাদের বাড়ীতে, অর্থাৎ মামার বাড়ীতে। এখানেই আমার জন্ম। দাদামহাশয় ও দিদিমা খুব বড় লোক ছিলেন, সাতটি মেয়েকে বিবাহ দিয়া ঘর-জামাই করিয়া কুলীনত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। আমাদের ভাই-বোন সকলেরই মামার বাড়ীতেই লালন পালন হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস বা আন্তরিক শ্রদ্ধা কখনও শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপর এতটা ছিল না, কিন্তু তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি যে ভাবে বিবাহের ব্যবস্থাদি করিবার জন্য আদেশ করিলেন, তাহাই মামাবাবু পালন করিলেন। আমি বাড়ীতে বলিয়াছিলাম, "বিবাহ হইলেই আমার মৃত্যু অনিবার্য্য, যদি রক্ষা পাই তো ওই সাধু যাহাকে তোমরা কেহই চিন না তাঁহারই কৃপায় রক্ষা পাইতে পারি।" বাড়ীতে যখন মেয়েটি তাহার মাতা ও ভ্রাতার সহিত আসিয়া পৌঁছিলেন তখন আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কেবল বিবাহের কথা হইতেই এত বন্ধন, এত দাবী, জোর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়িলেন, কোন প্রকারে নিষ্কৃতি নাই। ইঁহারা অবশেষে গুরুদেবের নিকট গিয়া অনুমতি লইয়া আসিলেন। বাবার আদেশ মত আমাকে সমস্ত কার্য্য

করিতেই হইল। ইচ্ছা ছিল যোগ-মতে দীক্ষা লইয়া পলাইয়া যাইব। তাহা বাবা বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা দিলেই সুরেন পলাইবে, বিবাহের পর দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিব।" —ক্রমশঃ

আধ্যাত্মিক পরিপৃচ্ছা

শুষ্কজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

সূচনা

তত্ত্ব ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই সকল প্রশ্ন কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রশ্ন হইলেও সাধারণতঃ অনেকের মনেই এইগুলি উদিত হয়। তাই ইহাদের সমাধান-সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণ ভাবে করিতে পারিলে উহা দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে। এই আলোচনার ফলে কাহারও মনে প্রসুপ্ত জিজ্ঞাসা জাগ্রৎ হইবে এবং কাহারও মনে পূর্ব্বোদিত জিজ্ঞাসার সমাধান হইবে। সমাধান না হইয়া যদি প্রশ্নান্তরের উদয় হয় তাহা হইলেও জ্ঞানের বিকাশের পথ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইতে পারে। কারণ উহাপোহের উদয়ই জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। এইজন্য আমরা যথাসম্ভব বিশুদ্ধবাণীর প্রতি ভাগেই "আধ্যাত্মিক পরিপৃচ্ছা" নামক প্রকরণে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সাধন সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। বক্তা ও জিজ্ঞাসুর কল্পিত সংবাদরূপে এই প্রকরণটি প্রকাশিত হইবে। বক্তা লেখক স্বয়ং, জিজ্ঞাসু একজন কর্ম্মী সাধক, যাহার কল্পিত নাম 'রাখাল'।

(২)

শুষ্কজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান

জিজ্ঞাসু। দাদা, আজ একটি জটিল প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম—প্রশ্নের বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব। আশা করি এই বিষয়ে আপনি কিছু আলোচনা করিবেন, যাহাতে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। শুষ্ক জ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানের পার্থক্য কি ইহাই আমার মূল জিজ্ঞাস্য।

বক্তা। শ্রীশ্রীগুরুদেব যেমন উন্মাদিনী ভক্তি হইতে দিব্য-ভক্তির পৃথক্ নির্দ্দেশ করিতেন, তদ্রূপ শুষ্কজ্ঞান হইতে দিব্যজ্ঞানেরও পার্থক্য স্বীকার করিতেন। তিনি যাহা বলিতেন শাস্ত্রেও তাহাই আছে। সর্ব্বদেশের মহাজনগণের অনুভবও উহার সাক্ষী। কিন্তু গভীর অনুভূতি এবং ব্যাপক দৃষ্টি না থাকিলে এই পার্থক্য ধারণা করা কঠিন। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধে যে অনুভূতি লাভ করিয়াছি তাহা অবলম্বন করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জি। আমরা সাধারণতঃ যে জ্ঞানের কথা শুনিতে পাই তাহা কি শুষ্কজ্ঞান না দিব্যজ্ঞান ?

ব। তাহাকে শুষ্কজ্ঞান বলাই বোধ হয় সঙ্গত। এই জ্ঞান বিবেক হইতে উদ্ভূত হয়। আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও অনাদি অজ্ঞানের প্রভাবে অচিৎ বা জড়ের কবলে পতিত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মই যে ইহার কারণ তাহা বলা যায় না। কারণ কর্ম্মও এই অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি জড়, মায়া ও জড়। মায়া সূক্ষ্ম, প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত স্থূল। স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ দেহ

এই জড়েরই কার্য্য বা বিকার। দেহের আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মা দেহকেই 'আমি' বলিয়া অভিমান করিতেছে। এই অভিমান স্থূলে যত স্পষ্ট, সূক্ষ্ম বা কারণে তত স্পষ্ট নহে, কিন্তু তবু ইহা আছে। সকল দেহই অনাত্মবস্তু।

অনাত্মাতে জ্ঞাতারূপে বা কর্ত্তারূপে আত্মাভিমান উৎপন্ন হইলেই উহা হইতে সাংসারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। কর্ম্মবীজ সঞ্চিত হয়, তাহার ফলে অনুরূপ দেহ ধারণ হয় ও ঐ দেহের দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ নিষ্পন্ন হয়। বিপক্ক বীজ ভোগের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। আবার ঐ দেহে ভোগ-কালেও অভিমান বশতঃ অভিনব কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। উহাও বীজ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। মৃত্যুর পর যথাসময়ে বিপাক-প্রাপ্ত বীজের দরুণ আবার দেহ ধারণ আবশ্যক হয়। এই প্রকারে জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। মূল অজ্ঞান থাকিয়া যাইতেছে, তাই কর্ম্ম-রচনারও বিরাম নাই, ভোগেরও বিরাম নাই। অনাদিকাল হইতে কালের রাজ্যে এই খেলা চলিতেছে। কর্ম্ম দেহে উৎপন্ন হয় এবং ঐ কর্ম্মের ফল-ভোগ দেহে অনুভূত হয়। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই ভোগের খেলা চলিতেছে। দেহাদিতে আত্মবোধ রূপ অজ্ঞান না কাটিলে কোন উপায়ে এই চক্র হইতে নিস্তার নাই। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি প্রভৃতিতে যে আত্মভাবনা তাহাই মিথ্যা-জ্ঞানের স্বরূপ। আত্মা দেহাদি হইতে একান্ত বিলক্ষণ, শুদ্ধ চিদাত্মক, অপরিণামী নিত্যবস্তু। কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ দেহাদিতে এই আত্মভাব ফুটিয়া উঠে। ইহাই অনাত্মাতে আত্মবোধ। তখন অভিমান জাগে—দেহাশ্রিত

ভাবে নিজেকে জ্ঞাতারূপে জানা হয় ও তাহার অনুরূপ জ্ঞেয়রাশি তাহার জ্ঞানের বিষয় হয়। এই জ্ঞান অজ্ঞানেরই কার্য্য। তদ্রূপ দেহাশ্রিত ভাবে নিজে কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করা হয়। তাহা হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানও অজ্ঞানেরই ফল।

সুতরাং এই ভব-চক্র হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। অনাত্মাকে অনাত্মা বলিয়া পৃথক্ ভাবে জানাই জ্ঞানের স্বরূপ। অনাত্মাকে 'আমি নই' বলিয়া চিনিতে পারিলেই বিবেক-জ্ঞান উদ্ভূত হইল বলা চলে। ইহাই বিশুদ্ধ বোধ। আত্মা যে শুদ্ধ চিদ্রূপ তাহা এই বোধেই প্রকাশিত হয়। এই বোধের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনাত্ম-সম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়। ইহাই বিশুদ্ধ চিদ্‌ভাবময় অবস্থা—এই অবস্থায় আনন্দের অভিব্যক্তি থাকে না। ইহা নিষ্ক্রিয় ভাব মাত্র। উত্তম কর্ত্তৃত্ব অথবা অহংভাব এই স্থিতিতে থাকে না। অহংভাব স্বাত্ম-বিশ্রান্তিরূপে অভিব্যক্ত হইলেই তাহাকে আনন্দ নাম দেওয়া হয়। আনন্দই স্বাতন্ত্র্যের নামান্তর। এই শুদ্ধ বোধ পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও সর্ব্ব প্রকারে অভিন্ন নহে, কারণ পরমেশ্বর পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ অখণ্ড বোধ স্বরূপ, কিন্তু এই শুদ্ধ বোধময় স্থিতিতে স্বাতন্ত্র্য নাই। সেইজন্য শুদ্ধ বোধকে ঠিক ঠিক ভগবৎস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। অহংভাবের বিমর্শ-বিশিষ্ট যে বোধ তাহাই ভগবত্তা। শুদ্ধ বোধ উভয়ে সমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসু। দিব্যজ্ঞান ও শুষ্কজ্ঞানের পার্থক্যটা এখনও স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। উভয় প্রকার জ্ঞানের স্বরূপ,

উদ্ভব প্রণালী এবং ফল নির্দ্দিষ্ট হইলে বোধ হয় অনেকটা সহজে এই পার্থক্য ধারণায় আনিতে পারিব।

বক্তা। বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলে আশা করি তুমি অনায়াসেই উভয় জ্ঞানের পার্থক্যটি ধারণায় আনিতে পারিবে। দেখ শুষ্ক জ্ঞান চিদচিদ্-বিবেক হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম অহংকার-গ্রন্থির বা হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ। অবস্থা-বিশেষে উৎকট বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উপাসনা প্রভৃতি হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। এই জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ। কর্ম্মবীজকে দগ্ধ করাই ইহার স্বভাব। ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ তপস্যা, মন্ত্র-জপ, ভজন প্রভৃতির প্রভাবে কর্ম্মাশয় তনুতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর জ্ঞানাগ্নি ঐ তনু অবস্থাপন্ন কর্ম্মবীজকে দগ্ধ করে। এই জ্ঞান বিবেক-জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। সত্ত্ব হইতে বিবিক্ত-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞানই বীজের দাহক। অজ্ঞান অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবোধ থাকিলে কর্ম্মাশয় বিপাক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্মাশয় দগ্ধ হয়। এই শুষ্ক জ্ঞান চিত্তের ধর্ম্ম। উপায় অবলম্বনে নিজ হইতে ইহা প্রকট হয় ও অজ্ঞানকে নাশ করে। পরে ইহা স্বয়ং নিবৃত্ত হয়। তখন কেবল জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা স্থিত হয়। ইহাই কৈবল্য বা মুক্তি। ইহা জন্ম-মৃত্যুর অতীতাবস্থা। এই পুরুষ নিষ্ক্রিয় চিৎ-স্বরূপ—ইহাতে আনন্দ নাই, গুণরূপে নাই স্বরূপেও নাই। সত্ত্বগুণের সঙ্গে যখন চিদাত্মক পুরুষের সম্বন্ধ ছিল তখন অবশ্য আনন্দ ছিল, কিন্তু এখন আর উহা নাই।

কিন্তু দিব্য জ্ঞান এই প্রকার নহে। ইহা একমাত্র ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই উৎপন্ন হয়—ইহা নিজের সাধনার ফলে জন্মে না।

ভগবান্ ক্রীড়াচ্ছলে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া পশু বা জীব সাজিয়াছেন। যিনি মহান্ তিনি অণু হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা তিনি অল্পজ্ঞ ও অল্পকর্ত্তা হইয়াছেন, যিনি নিত্য ও বিভু তিনি কাল ও দেশের আবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি আপ্তকাম ও নিত্যতৃপ্ত তিনি নিজেকে অপূর্ণ মনে করিয়া নিজ হইতে ভিন্ন অপর কিছু প্রাপ্তির জন্য কামনা-যুক্ত হইয়াছেন। এইভাবে মহান্ পুরুষ সঙ্কোচ গ্রহণ করিলে মায়া ও কর্ম্মরূপ দুইটি পাশ তাহাকে আবদ্ধ করে। পূর্ব্ববর্ণিত সঙ্কোচের ফলে স্বভাবসিদ্ধ অভেদ জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু ভেদজ্ঞান তখনও আসে না। মায়ার আবরণ গ্রহণ করিবার পর ভেদজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার পর কর্ম্মের প্রভাবে কর্ত্তৃত্ব-অভিমান উদিত হয় ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম করা ও তাহার ফলভোগ করা উভয়ই দেহ-সাপেক্ষ—এই দেহ মায়িক উপাদান হইতে রচিত হইয়া থাকে। কারণদেহ, সূক্ষ্ম-দেহ ও স্থূলদেহ দেহেরই প্রকার-ভেদমাত্র। স্থূলদেহের বিকাশ পূর্ণভাবে না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মও ঠিক ঠিক হয় না এবং ইহার ফলভোগও ঠিক ঠিক হইতে পারে না।

নিবৃত্তি-মার্গে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মায়া ও কর্ম্ম কাটিয়া গেলেও পশুভাব বা জীবভাব কাটে না। কর্ম্ম অজ্ঞান প্রসূত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অবিবেক রূপ অজ্ঞান কাটিয়া গেলে কর্ত্তৃত্ব-অভিমান থাকে না। তাই কর্ম্মও থাকে না। ইহার ফলে পুনঃ পুনঃ দেহ-গ্রহণ রূপ সংসার নিবৃত্ত হইয়া যায়। মৃত্যুরাজ্য হইতে জীবের উদ্ধার হয় এবং কর্ম্মের অভাবে মৃত্যুরাজ্যে পতনের

সম্ভাবনা থাকে না। ইহা অচিৎ হইতে মুক্ত শুদ্ধবোধের অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকে মুক্তি বলা হয় এবং এই অবস্থাটিকে মুক্তি বলিলে কোন দোষের কারণ থাকে না। কারণ সংসারের বন্ধন চিরদিনের জন্য কাটিয়া গিয়াছে এবং ঐ বন্ধনের পুনরুদ্গমের সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু এই অবস্থাতেও আত্মার পশুভাব কাটে না, আত্মা ভগবত্তা লাভ করে না, এমন কি ভগবৎ রাজ্যেও প্রবিষ্ট হয় না, পূর্ণ মহেশ্বর-ভাব-প্রাপ্তি ত দূরের কথা।

জিজ্ঞাসু। অবিবেক-নিবৃত্তি হইলে আত্মা যখন স্বরূপ-স্থিত হয় তখনকার অবস্থা কৈবল্য নামে পরিচিত। এই অবস্থায় কি স্থিতিগত ভেদ থাকার সম্ভাবনা আছে ?

বক্তা। বিশুদ্ধ কৈবল্য একই, তাহাতে কোন প্রকার ভেদের আশঙ্কা নাই। তবে অচিৎ বা জড় সত্তার স্থূলাদি ভেদ স্বীকৃত হয় বলিয়া ঐ সত্তা হইতে বিবেক লাভ করাও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি, মায়া ও মহামায়া, জড়ের এই তিনটি মুখ্য স্তর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি স্থূল ও ত্রিগুণাত্মক। মায়া সূক্ষ্ম, ইহা নির্গুণ অথচ মলিন। মহামায়া সূক্ষ্মতম, ইহা বিশুদ্ধ অবস্থা হইলেও অচিতেরই অবস্থা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ আত্মা পশুভাব নিয়া মহামায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রকৃতি ও মায়ার রাজ্যে যে অজ্ঞান রহিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকার অজ্ঞান মহামায়ার রাজ্যে খেলা করিয়া থাকে। অনাত্মাতে আত্মবোধই অজ্ঞানের স্বরূপ, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই অজ্ঞান

প্রকৃতি ও মায়ারাজ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অজ্ঞান কাটিয়া গেলে অর্থাৎ কেবল জ্ঞানের উদয় হইলে যে শুদ্ধ বোধরূপ স্থিতি লাভ হয় তাহাতে পশুত্ব নিবৃত্ত না হইলেও সংসার ও জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন বিবর্ত্তন চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই কৈবল্য অবস্থার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

জিজ্ঞাসু। ইহার পরেও কি কৈবল্য অবস্থা আছে? যদি থাকে তবে উহার হেতুভূত বিবেক-জ্ঞান কি প্রকার?

বক্তা। এই দ্বিবিধ কৈবল্যের উপরে উত্তম কৈবল্যের স্থান জানিতে হইবে। ঐ অবস্থায় আত্মা মহামায়া হইতেও নিজের স্বরূপকে পৃথক্ রূপে সাক্ষাৎকার করে। কিন্তু এই অবস্থা সাধারণ জীব ত দূরের কথা—কেবলীর পক্ষেও অতি দুর্লভ। ইহার কারণ এই যে মহামায়া-দেহ প্রাপ্ত না হইলে ঐ দেহ হইতেও পৃথক্‌রূপে নিজেকে জানিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

মহামায়ার দেহ একমাত্র শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহা অধোবর্ত্তী কালের রাজ্যের দেহ নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া চিন্ময় জ্যোতি দ্বারা এই দেহ রচনা করে। সদ্-গুরুর কৃপা-কটাক্ষ ব্যতিরেকে সুপ্ত মহামায়া ক্ষুব্ধ হয় না এবং দেহও রচনা করে না। এই দেহকে Spiritual Body বলিয়া St. Paul, St. John প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য সাধকগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গুরুশক্তির ক্রিয়া ভিন্ন এই দেহ উৎপন্নই হয় না। মলপাক, কর্ম্মসাম্য প্রভৃতি নিমিত্ত সহকারে অথবা বিনা নিমিত্তে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য বা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চার

হইলে বিশুদ্ধ মহামায়া হইতে এই দেহ রচিত হয় এবং দীক্ষার্থী শিষ্য উহা প্রাপ্ত হয়। এই দেহ দ্বারা শুদ্ধ আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং বিশুদ্ধ বাসনা-ক্ষয়ের উপযোগী পন্থা খুলিয়া যায়। এই দেহের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে ইহার প্রতিও বৈরাগ্য হয় এবং নিজের আত্ম-স্বরূপ যে ইহা হইতেও ভিন্ন তাহা অনুভূত হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ কৈবল্য অবস্থা। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার কৈবল্য হইতে ইহার উৎকর্ষ অধিক। মহামায়ার দেহকে বৈন্দব দেহ বলে। শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ যে ইহা হইতেও ভিন্ন তাহা এই কৈবল্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিজ্ঞাসু। যাহাকে শিবত্ব অথবা ভগবত্তা বলা হয় ইহাই কি সেই অবস্থা?

বক্তা। না। ভগবত্তা অথবা শিবত্ব আত্মার পরম স্বরূপ। আংশিকভাবে মহামায়ার দেহ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা অধিগত হয়, কিন্তু উহার পূর্ণ প্রাপ্তি মহামায়া দেহ থাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে না। মহামায়া-দেহের প্রাপ্তি দিব্যজ্ঞান হইতে সম্ভবপর হয়। উহা শুষ্কজ্ঞানের কার্য্য নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দিব্যজ্ঞান ভগবৎ-অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। দিব্যজ্ঞানের প্রভাবেই পশুত্ব কাটিয়া যায় এবং শিবরূপী আত্মা পুনর্ব্বার শিবধর্ম্মে অন্বিত হয়। মহামায়ার রাজ্যে এই ব্যাপারের সূচনা হইলেও পূর্ণাভিষেক রূপ পূর্ণত্ব লাভ ঘটে না। পূর্ব্বে অনাত্মাতে আত্মবোধ রূপ অজ্ঞানের কথা বলিয়াছি। কিন্তু আত্মাতে অনাত্মবোধ অজ্ঞানও বিদ্যমান আছে। পূর্ণ শিবত্বের পূর্ব্বে উহাও নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। উহা প্রকৃতির রাজ্যে অথবা

মায়ার রাজ্যে অর্থাৎ অধোবর্ত্তী কালের রাজ্যে হইতে পারে না, এমন কি কৈবল্য-অবস্থাতেও হইতে পারে না। কারণ কৈবল্য অবস্থা বিদেহ অবস্থা,—বিদেহ-দশাতে কর্ম্মের সম্ভাবনা থাকে না। জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ের সম্মিলন হইতেই দিব্য জ্ঞানের বিকাশ হয়। সুতরাং দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা সিদ্ধ হইলেও ক্রিয়া-শক্তির পূর্ণতা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে বলিয়া পরিপূর্ণতা আসে না। ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ না হইলে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ কি প্রকারে হইবে ? স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরত্ব অসম্ভব। দিব্য জ্ঞানের পথে সম্যক্ আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হয় বলিয়া প্রথমে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াও তখনই সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টসিদ্ধি ঘটে না, পূর্ণ মহেশ্বরত্বের ও উদয় হয় না। তাহা জ্ঞানোত্তর ক্রিয়া-শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া-শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাতে অনাত্মবোধ রূপ অজ্ঞান কাটিতে থাকে। আত্মাতে আত্মবোধই পূর্ণ অবস্থা বা সম্যক্ জ্ঞান। অবিবেক রূপ অজ্ঞান মূল বীজভূতরূপে তখনও যাহা থাকে তাহা কাটিয়া গেলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-কৈবল্যের উদয় হয়। ইহাই আত্মস্বরূপের বিশুদ্ধতম স্থিতি, বস্তুতঃ ইহাই আত্মার নিষ্ক্রিয় শব-ভাব। অভিষেকের ফলে বিশুদ্ধ চিৎ-শক্তির অভিব্যক্তি হয়। তখন ঐ শব শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শিবই মহেশ্বর। দীক্ষাকালে অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ কালে যে সম্যক্ জ্ঞানশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা এই অবস্থায় পূর্ণ ক্রিয়াশক্তির সহিত অভিন্ন হইয়া ইচ্ছাশক্তিরূপে ফুটিয়া আত্মাতে স্থান লাভ করে।

এই ইচ্ছাশক্তিই পরমেশ্বরের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের পূর্ণ ভগবত্তা। অবশ্য ইচ্ছার অতীত স্থিতিও আছে—তাহা অব্যক্ত।

জিজ্ঞাসু। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে অজ্ঞান যেমন দুই প্রকার, অজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞানও সেইরূপ দুই প্রকার। প্রথম জ্ঞানের নাম শুষ্ক জ্ঞান এবং দ্বিতীয় জ্ঞানের দিব্যজ্ঞান। ইহা কি ঠিক নহে?

বক্তা। সতাই তাহাই। শুষ্ক জ্ঞানের ফলে ভগবত্তা লাভ ত হয়ই না, শ্রীভগবানের রাজ্যে সেবকরূপেও প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু উহা বৃথা নহে, কারণ কর্ম্মবীজ নাশ করিয়া মায়াকে তিরোহিত করিয়া বিশুদ্ধবোধ রূপে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা উহারই কার্য্য। এ অবস্থায় সংসারে পতনের আশঙ্কা থাকে না, ইহা সত্য। কিন্তু উর্দ্ধে উত্থানেরও সম্ভাবনা থাকে না।

জিজ্ঞাসু। শুষ্ক জ্ঞানের পথ আলাদা, দিব্য জ্ঞানের পথ আলাদা। উভয়ের ফলও পৃথক্। মহত্ত্ব বিষয়েও উভয়ে তারতম্য আছে।

বক্তা। বিবেক বা বিয়োগের পথে শুষ্ক জ্ঞানের উদয় হয়, যোগের পথে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। মহত্ত্ব দিব্য জ্ঞানেরই অধিক। কারণ শুষ্ক জ্ঞানের যাহা লক্ষ্য তাহা দিব্যজ্ঞান হইতেও সিদ্ধ হইতে পারে—বস্তুতঃ তাহা হয়ই। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞান হইতে দিব্যজ্ঞানের লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শুষ্কজ্ঞানে যে অজ্ঞান কাটে তাহার ফলে কর্ম-বন্ধন স্থগিত হইয়া যায় এবং আত্মা

কালের ঘূর্ণি হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এ স্থিতি অবশ্য জ্ঞানেরই স্থিতি। জাগতিক হিসাবে দেহ-বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় বলিয়া আর দেহারম্ভও ঘটে না। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যোগ লাভ হয় না—ভগবত্তা ত দূরের কথা।

সিদ্ধ পুরুষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

আমাদের দেশে সকলেই বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধ পুরুষ কাহাকে বলে তাহা না জানিলেও তাহাদের সাধারণ ধারণা এই যে, মানুষ নিজের জীবনে এমন একটি অলৌকিক অবস্থা লাভ করিতে পারে যখন সে আর সাধারণ মানুষ থাকে না—তাহার অলৌকিক শক্তি লাভ হয় এবং সে মনুষ্য-জীবনের একটি মহান্ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জীবনের পথে অনেকটা পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। যে কোন সাধনায় সফল হইলেই সাধককে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ বলিতে সাধারণতঃ লোকে ঐ সকল পুরুষকে লক্ষ্য করে না। প্রাচীন কালে চুরাশী জন সিদ্ধ পুরুষের কথা সাহিত্যে শুনিতে ওাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যা অনন্ত।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সিদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। সিদ্ধাবস্থা লাভের উপায় সকল ধর্ম্মেই আছে। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টীয়, সুফী, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়েও সিদ্ধ পুরুষ আছেন। কি প্রকারে মনুষ্য প্রকৃত সিদ্ধ পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(২)

সমগ্র সৃষ্টি অথবা বিশ্বের মূলে এমন একটি মহাশক্তিধর সত্তা আছেন যাঁহাকে অদ্বৈত ও অখণ্ড না বলিয়া পারা যায় না। এই সত্তাটি চৈতন্য-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ—ইহাতে অনন্ত প্রকার অনন্ত শক্তি অভিন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইনি এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনন্ত, এবং অক্ষত ও নির্ব্বিকার—ইনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ। দেশ কাল ও নিমিত্ত ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা ইনি নিয়ন্ত্রিত হন না। মনুষ্য জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার সহিত পরিচিত, কিন্তু পূর্ণ সত্য অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপ এই ত্রিবিধ অবস্থায় পাত্রে পারদবৎ থাকিয়াও উর্দ্ধে নিত্যই অতি-চেতন অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। এই অতিচেতন অবস্থা চৈতন্যেরই অবস্থা। ইহাকে তুরীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে—ইহা অপ্রতিহত এবং নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎকারাত্মক প্রকাশের অবস্থা। কিন্তু ইহার পরে এমন একটি গভীর অবস্থা আছে যেখানে বোধেরও উন্মেষ নাই এবং যেখানে বোধ-সহকারে প্রবেশ করাও যায় না। বস্তুতঃ ইহা কোন অবস্থাই নহে, একটি স্থিতি মাত্র। অতিচেতন অবস্থারও অতীত বলিয়া ইহাকে এক হিসাবে অচেতন অবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা অচেতন অবস্থা নহে, বরং চৈতন্যের ঘনীভূত অবস্থা। ইহা প্রকাশের ঘনীভূত অপ্রকাশ। ইহা আপাতদৃষ্টিতে জড় বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ইহা জড় ও চেতন এই দ্বন্দ্বভাবের অতীত। ইহাই ভগবানের স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তি থাকিলেও এই স্থিতি

হইতে ঐ সকল শক্তির প্রয়োগ সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন স্তরেই হয় না। যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি সত্যের অপার ও অতল প্রকাশ, তিনি নিজে তৎস্বরূপ হইয়াও তাহা যেন জানেন না। এই স্থিতি কিয়দংশে আমাদের পরিচিত গভীর সুষুপ্তির অনুরূপ।

(৩)

কিন্তু এই স্থিতি হইতে জগতের সৃষ্টি হয় না। যাঁহাকে আমরা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করি তিনি এই পূর্ণ সত্য হইতে অভিন্ন হইলেও চেতন পুরুষ। তিনি নিরন্তর সৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন এবং সে বোধও তাঁহার আছে। কিন্তু তিনিই যে অখণ্ড অনন্ত পরম তত্ত্ব তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে তিনি যেন জানেন না এবং তাহা জানিবার প্রয়োজনও যেন হয় না। মনুষ্য সিদ্ধাবস্থাতে যে পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার সঙ্গেও তাঁহার যেন কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার একমাত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত। এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর দেশ ও কালের অতীত নহেন এবং কার্য্য-কারণ-ভাবের সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বোধ-কেন্দ্র হইতেই অনন্ত বিশ্বের নির্গম হইয়া থাকে। যত দিন তিনি ক্রিয়াশীল থাকেন সেই সময়-পরিমাণকে এক হিসাবে কল্প বা মহাকল্প নাম দেওয়া যাইতে পারে। সমস্ত বিশ্বই তাঁহার কর্ম্মের ক্ষেত্র।

যাহাকে আমরা জীব বলিয়া বর্ণন করি তাহাকেও পূর্ণ সত্য হইতে পৃথক্ বলা চলে না। ঈশ্বরও পূর্ণ হইতে ভিন্ন নহেন এবং জীবও ভিন্ন নহে, কিন্তু ঈশ্বর চেতন এবং জীব আংশিক চেতন ও আংশিক ভাবে অচেতন। জীব তাহার ক্ষুদ্র

অংশটিকে জানে, কিন্তু সে নিজেই যে বাস্তবিক পক্ষে আত্মা—যাহা অনন্ত এবং অখণ্ড—তাহা সে জানে না। দেশ ও কাল এবং কার্য্য-কারণ ভাবের নিয়ম জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জীবও পূর্ব্ব বর্ণিত কল্প বা মহাকল্প পর্য্যন্ত অবস্থান করে, তাহার পর সে নিজেকে পূর্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পূর্ণ রূপে স্থিতি লাভ করে। আত্ম-স্বরূপের সহিত মন প্রাণ প্রভৃতি উপাধির যোগ হইলে জীবরূপে আত্মার আবির্ভাব হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিতে হইলে উপাধিমূলক এই জীবভাবটি ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু মৃত্যুর ফলে এই অবস্থার প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। কারণ জাগতিক বাসনা থাকা পর্য্যন্ত মৃত্যুর পরেও জীব-ভাব কাটে না এবং পূর্ণভাবে বাসনা কাটিয়া গেলে দেহ থাকিতেও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। এই সকল বাসনা বা সংস্কারকে জ্ঞান-পূর্ব্বক রোধ করিতে হইবে। মনুষ্যের চিত্ত এই সকল সংস্কারের দ্বারা সর্ব্বদাই অনুবিদ্ধ থাকে বলিয়া চৈতন্য নিজেকে নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল সংস্কারকে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে প্রকৃত সত্য-দর্শন প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর। জীব-ভাব-বর্জ্জিত আত্মা বস্তুতঃ শুদ্ধ আত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং জীবনের ধারা থাকিতে থাকিতেই জীব-ভাবের অতীত হওয়া আবশ্যক। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই এই যে বোধাতীত পরম তত্ত্বকে বোধে ধারণ করিয়া সংসারের এবং দেহের যাবতীয় বাসনা বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রতি মনুষ্যই নিদ্রাকালে বাসনা বর্জ্জন করিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ইহা জ্ঞান পূর্ব্বক করে না, কিন্তু

অচেতন ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে করিয়া থাকে। তাই তাহাকে পুনর্ব্বার উঠিতে হয়। এই জন্য নিদ্রা অথবা সাধারণ মৃত্যু সকল মনুষ্যের প্রকৃত কাজে আসে না, গভীর নিদ্রাতেও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। কারণ যদিও নিদ্রাতে মনুষ্যের দেহ-স্মৃতি থাকে না তথাপি জাগিয়া উঠিলে সেই স্মৃতি পুনর্ব্বার ফুটিয়া উঠে। এই গভীর নিদ্রা মৃত্যুর ফলে ঘটিয়া থাকে। তখন জাগিয়া উঠিয়া জীব দেখিতে পায় যে সে নূতন দেহে নূতন আবেষ্টনের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব-স্মৃতির রক্ষা হয় না বলিয়া নূতন বলিয়া বুঝিতে পারে না। এইজন্য যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে মরিয়া মরা নিস্ফল, কিন্তু জীয়ন্তে মরা আবশ্যক। জীয়ন্তে মরা কাহাকে বলে ? বোধাতীত অবস্থার বোধ সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করা, ইহাই জীয়ন্তে মরা। এই অবস্থায় একদিকে লিঙ্গহীন নির্ম্মল আত্ম-স্বরূপের পূর্ণ বোধ জাগিয়া থাকে ও অন্যদিকে দেহ মন ও বিশ্বের চেতনা থাকে না।

(৪)

জীব মায়াজাল ভেদ করিয়া সৃষ্টিকে ভেদ করিতে পারিলে নিজেকেই শিবরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই তাহার জীবনের সার্থকতা। সে তখন তাহার নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে। ইহাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তাহার নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেদ অর্থাৎ জীব জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদ আর থাকে না। সে আর পূর্ব্বের ন্যায় তখন দেশ কাল ও নিয়তির অধীন থাকে না। সে তখন নিজেকেই সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণসত্য বলিয়া চিনিতে পারে। তাহার এই স্থিতি আর কখনও ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা

থাকে না। কোনও প্রকার জাগতিক পরিবর্ত্তন তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। সে বুঝিতে পারে যে, সে পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় সত্তাতেও ছিল। ছিল কেন?—আছে। কিন্তু ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে ইহা তাহার বোধগম্য হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরম তত্ত্বের সহিত জ্ঞান ও চৈতন্যের যোগ হওয়াতে এই অবস্থার উদয় হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধাবস্থা। ইহা নিত্য জাগ্রৎ অবস্থা। জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য ও দৃষ্টি এবং প্রেমিক প্রেমপাত্রও প্রেম এখানে অভিন্ন। একমাত্র সিদ্ধ পুরুষই এই অদ্বয় স্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ। অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালেই তিনি এক। বস্তুতঃ সকলেই তাহাই, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় তাহা বুঝিতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে এক পরমাত্মাই পরম তত্ত্ব—ঈশ্বর জীব ও সিদ্ধ পুরুষ রূপে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রকার খেলা করিতেছেন। পরমাত্মা অবস্থায় পরমতত্ত্ব এক অখণ্ড ও অনন্ত স্বরূপে জ্ঞানের অগোচর ভাবে অনন্ত শক্তি, অনন্ত সত্তা ও অনন্ত চৈতন্য ধারণ করিয়া আছেন। ঈশ্বররূপে এই সকল শক্তিই তাঁহার আছে, কিন্তু তিনি শুধু বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার ব্যাপার অনুভব করিতেছেন। জীব রূপেও তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু নিজেকে বাসনা দ্বারা বদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধরূপে অনুভব করিতেছেন। তাঁহার সিদ্ধ অবস্থাটি সেবাত্মক অবস্থা। একমাত্র এই অবস্থায় তিনি চেতনভাবে তাঁহার অনন্ত শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

(৫)

এই যে সিদ্ধাবস্থার কথা বলা হইল ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পরের অবস্থা। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বলিতে শুধু ভগবদ্-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান বুঝায় না—ইহা প্রকৃতই ভগবানের সহিত যুক্ত অবস্থা। এই অবস্থার প্রাপ্তি না ঘটিলে কোন সাধককেই যোগী বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। এই অবস্থায় জীব নিজের পৃথক্ সত্তাবোধ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব প্রকার দ্বৈত ভাবকে অতিক্রম করে। পরমাত্মার সহিত তাহার যে তাদাত্ম্য রহিয়াছে তাহার স্থায়ী জ্ঞান তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব যদিও তখন উপলব্ধি করে যে, এই অবস্থা তাহার অনাদিকাল হইতেই ছিল তথাপি সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে ইহা তাহার বোধগম্য এবং আস্বাদনের বিষয় রূপে ছিল না, ইহা বলিতেই হইবে। যে অসীম এবং অব্যাহত আনন্দ সিদ্ধ পুরুষগণ অনুভব করেন তাহা কোন অভূতপূর্ব্ব বস্তু নহে। তাহা পরমাত্মস্বরূপে অনাদিকাল হইতেই ছিল, কিন্তু সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার প্রকাশ হয় নাই। সাধক সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে ইহা মনে করা চলে না যে, সে কোন একটি পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। সে পূর্ব্বেও যাহা ছিল তখনও তাহাই থাকে। তাহার স্বরূপের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। তবে যাহা পূর্ব্বে সে জানিত না, সাক্ষাৎকারের পরে সে তাহা জানিতে পারে, ইহাই মাত্র ভেদ। অনাদিকাল হইতে এই যে ক্রম-বিকাশের খেলা চলিতেছে ইহা একটি খেলা মাত্র। ইহা মায়ার বিলাস, ইহার কোনই বাস্তবিক সত্তা নাই। ইহা আত্মহারা জীবের নিজেকে ফিরিয়া পাইবার কৌশল মাত্র।

জগতের মায়াজালে জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া এই খেলাটি সময় সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। মায়াজালে জড়িত হইবার মূল কারণ জীবের অহঙ্কার। জীব প্রথমাবস্থায় অহঙ্কার-শূন্যই থাকে, কিন্তু তাহার চৈতন্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের বিকাশ হয়। এই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই মোহ অথবা অবিদ্যা গুপ্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। জীবের নিজ স্বরূপে অনন্ত জ্ঞান নিহিত থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির পথে ইহাই একমাত্র বাধক। গভীর নিদ্রার সময় জীব পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য উপভোগ করে, কিন্তু এই উপভোগের সচেতন অনুভব হয় না। সুষুপ্তি কালে জগতের ভ্রম অল্প সময়ের জন্য তিরোহিত হয়, কারণ তখন চেতনা স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ভগবান্ বা আত্ম স্বরূপের সচেতন অনুভূতি ফুটে না, কারণ অহঙ্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হইলে এবং চৈতন্যের ধারা ভগবানের দিকে উন্মুখ না হইলে শুধু বাহ্য জগতের জ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয় না। কখনও কখনও এমন হয় যে সুষুপ্তির গাঢ়তা ভাঙ্গিয়া যায় অথচ জাগ্রৎ অবস্থার উদয় হয় না। এই প্রকার সন্ধিক্ষণে চৈতন্য নিরালম্ব ভাবে অল্পক্ষণের জন্য আত্মপ্রকাশ করে। এইটি বোধের অবস্থা—জড়ত্ব নহে। কিন্তু কিসের বোধ? বিশ্বের নহে। এই ব্যাপক অভাবের বোধটি তখন জাগিয়া উঠে। ইহাকেই মহাশূন্যাবস্থা বলে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব সূচনা। চৈতন্য জগতের ইন্দ্রজাল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অহঙ্কারে নিহিত অনন্ত জ্ঞানকে

প্রকাশিত করিলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রকাশ-কাল বলা যাইতে পারে। একমাত্র সিদ্ধ পুরুষেই এই প্রকার অনন্ত জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর। সিদ্ধ পুরুষে পরমাত্মা নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানেন, কিন্তু এই জ্ঞান সাধকাত্মাতে অথবা অসাধক অবস্থায় বদ্ধ আত্মাতে যে পরমাত্মা আছেন তাহাতে থাকে না। এইজন্যই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগত ব্যাপার। একই পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও এক আধারে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ-জ্ঞান খুলিয়া যায়, কিন্তু অন্য আধারে যায় না। যদি তাহা যাইত তাহা হইলে একজনের ভগবত্তা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের বিচিত্র লীলার অবসান হইয়া যাইত। অবশ্য যে কোন আত্মা সাধন-বলে যথাসময়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ তাহাতে কোন বাধা নাই। অহঙ্কারের গ্রন্থি এবং জগতের ইন্দ্রজাল হইতে যে আত্মা মুক্তিলাভ করে তাহারই পক্ষে পরমাত্মভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবপর, সকলের পক্ষে নহে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ফলে আত্মা কিছু প্রাপ্ত হয় কি ? এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্ব্বে প্রাপ্তি শব্দের অর্থ কি তাহা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে প্রাপ্তি বলে, আবার নিত্য-প্রাপ্ত বস্তুও মোহ বশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইলে মোহ-নিবৃত্তি দ্বারা নিত্য-প্রাপ্ত অবস্থার পুনরভিব্যক্তিকেও প্রাপ্তি বলে।

আত্ম-প্রাপ্তি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। ইহা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে, তথাপি ইহার মহত্ত্ব অপরিসীম। অসিদ্ধ পুরুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে করে ও সুখ দুঃখ ভোগ

করে, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার আনন্দ ও জ্ঞানের অন্ত নাই।

ভাগবত জ্ঞানের প্রাপ্তি নানা উপায়ে হইতে পারে। প্রেমই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। বিচার-মূলক জ্ঞান অন্য প্রকার। প্রেমের দ্বারাই বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ও পূর্ণ আত্মবিলোপ সংঘটিত হয়। ইহার পর ভগবানের সঙ্গে মিলন হয়। দিব্য প্রেমের প্রেমিক নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ভুলিয়া যায় এবং ক্রমশঃ মানবীয় সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে। ক্রমবিকাশের ফলে নিজের পরম সত্তা অভিব্যক্ত হয়। যখন মায়া ও দ্বৈতপ্রপঞ্চ হইতে আত্মা মুক্ত হয়, তখন সে একীভাব প্রাপ্ত হয়। তাই ঐ সময় মূল অদ্বয় সত্তার আকর্ষণ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। এই পথে প্রেমের প্রেরণাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

এই পথের তিনটি অংশ বা বিভাগ আছে। প্রথম অংশে পর পর অনেকগুলি স্তর আছে। এইগুলিকে ভূমি বলা যাইতে পারে। দিব্য জ্ঞানের সূত্রপাত হইতে পূর্ণ আত্মবিলোপ পর্য্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত। এই পথের চরমাবস্থাতে অহঙ্কার-নাশ সিদ্ধ হয় ও মায়িক ধারা হইতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরে বিচ্ছেদের সংস্কার পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। সুফী সাধকগণ এই স্থিতিকে 'ফনা' বলিয়া বর্ণনা করেন। এই দীর্ঘ পথের যে যাত্রী তাহার সম্বল কি? শুদ্ধ আত্মা ও তাহার আনুষঙ্গিক চেতনা-সংস্কার, অহঙ্কার ও মন। এই অহঙ্কার শুদ্ধ আত্মারই বিকৃত রূপ— মিথ্যা রূপ। ইহার পূর্ণ লোপই স্থিতির লক্ষ্য। অহঙ্কার

নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম, বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি সব লুপ্ত হয়। এগুলি অহঙ্কারে জড়িত হইয়া মনোময় কোষে অবস্থান করে। তখন একমাত্র চেতনা অবশিষ্ট থাকে—তাহার লোপ হয় না। সব গুণকর্ম্মাদির অভাব হয়, জ্ঞানেরও অভাব হয়। কিন্তু এই অভাবের চেতনা বা বোধটা থাকে। ইহা শূন্যের বোধ মাত্র। অহঙ্কার থাকে না বলিয়া "আমি অকিঞ্চন" এই প্রকার ভাবও থাকে না। তখন ভগবান্ নাই, বিশ্ব নাই, স্রষ্টা নাই, সৃষ্টি নাই, কিছু নাই—অথচ চেতনা আছে। ইহা অচেতন চেতনা। ইহা বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করা কঠিন। এই চেতনা স্থূল, সূক্ষ্ম, মিথ্যা, সত্য, জগৎ বা ভগবানের বিষয়ে নহে—অথচ চেতনা আছে। ইহা উপরাগ রহিত চেতনা। সংস্কার, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি লুপ্ত হওয়ার পরও চেতনা থাকে বলিয়া তখন প্রকৃত আমির দিকে লক্ষ্য যায়। বিকৃত অহং নাই, তাই শুদ্ধ অহং ভাসে।

সাধারণ মানব-চেতনাতে সংস্কার বশতঃ এই প্রকৃত আমি ধরা পড়ে না। ঐ চেতনা ভ্রান্ত। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মাও অন্তশ্চেতন ছিলেন। সিদ্ধগণ বলেন যে তিনি পরমাত্মা বলিয়া নিজেকে চিনিতেন না। তাই বলা চলে যে তাঁহার "প্রকৃত আমি" ছিল না। আপাততঃ বিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহা সত্য কথা। মিথ্যাজ্ঞানের উপরই সত্যজ্ঞান নির্ভর করে। সংস্কার-জন্য মিথ্যাজ্ঞান মূলক মিথ্যা অহং এর উপরেই প্রকৃত আমি নির্ভর করে।

পথের প্রথম অংশের চরম লক্ষ্য যে শূন্য অবস্থা তাহার কথা বলা হইল। এবার দ্বিতীয় অংশের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত

চেতনা ক্রমশঃ প্রকৃত আমিকে প্রাপ্ত হইবে। ইহার ইতিহাসই দ্বিতীয় অংশের বিষয়। এই সময়ে ঐ অচেতন চেতনা রূপান্তরিত হইয়া "আমি চেতনা" এইরূপ ধারণ করে। এই বোধই পরমাত্মার বোধ যাহা "আমি পরমাত্মা" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় অংশের অবসানে এই উপলব্ধি জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সুফীগণের পরিভাষাতে ইহাই 'বকা'। ইহাই প্রকৃত ভগবত্তার বোধ।

কিন্তু ইহাও সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা নহে। সিদ্ধ পুরুষের স্থিতি যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" স্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা বলা হইতেছে না। তবে উভয়ে ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে বলিতেই হইবে। বস্তুতঃ "আমি ব্রহ্ম" এই দশা হইতে উচ্চতর অবস্থা হইতেই পারে না। চরম অতিচেতনা অবস্থা হইতে অধিকতর উৎকর্ষ কল্পনীয় নহে। ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের অপ্রাপ্ত বা অসিদ্ধ কিছুই থাকে না, ইহা সত্য। মন, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ, দেশ, কাল, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, লোক-লোকান্তর কিছুই তখন থাকে না। ইহা চিন্তা ও কল্পনার অতীত। নিত্য, স্থির, ত্রিপুটীরহিত বিশুদ্ধ অদ্বয় স্থিতি। তখন একই থাকে—দ্বন্দ্বের ক্রিয়া থাকে না। সকল সাধনার ইহাই চরম সিদ্ধির অবস্থা।

সিদ্ধিলাভের পর কেহ কেহ দেহ থাকা সত্ত্বেও আর অগ্রসর হন না। স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাতে ইঁহাদের যোগ থাকে না। ইঁহারা পূর্ণতার প্রতীক স্বরূপ। ইঁহাদের সত্তা অনন্ত ও অসীম জ্ঞানময়।

কিন্তু পথের আরও একটি অংশ আছে—উহাকে তৃতীয় অংশ

বলা হইয়াছে। উহা সকলের জন্য নহে। উহা সদ্‌ গুরুর বিশ্বোদ্ধার কার্য্যে যাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাঁহাদের জন্য। পথের তৃতীয় অংশে সূক্ষ্ম ও স্থূল চেতনার পুনরুদ্ধার ঘটিয়া থাকে। কারণ তাহা না হইলে সাধারণ জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না ও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-বিস্তার রূপ জগদ্‌-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। আধিকারিক পুরুষগণের জন্য পথের এই তৃতীয় অংশ উদ্দিষ্ট। আগমে নির্ব্বাণ-দীক্ষার পরে আচার্য্য-দীক্ষার সম্ভাব্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষের অতিচেতনা ত অক্ষুণ্ণই থাকে, অথচ সৃষ্টিবিষয়ক চেতনারও অভিব্যক্তি থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ 'মজুব' ও সদ্‌-গুরু ভাবাপন্ন অর্থাৎ 'কুতুব'সংজ্ঞক পুরুষে স্থিতিগত কোন পার্থক্য নাই—অথচ ভাবগত পার্থক্য আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠের দৃষ্টিতে সৃষ্টি নাই, কিন্তু অনুগ্রাহক গুরুর দৃষ্টিতে সৃষ্টি আছে, তবে উহা ব্যক্তিগত, অহং এর শুদ্ধ কল্পনাপ্রসূত। এই গুরুই নররূপী বিরূপাক্ষ (God-man)।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের রচিত চারিটি গান

(শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ হইতে প্রাপ্ত)

সম্পাদক

(১)

হরি তুমিও আমার, আমিও তোমার,
তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই।
তুমি না থাকিলে না থাকিব আমি,
আমি না থাকিলে না থাকিবে তুমি,
তুমি আমি কেবা তাই তোমায় শুধাই ॥

(২)

ভবের তুফান দেখে ডরাস্ না মন, ভয় কি মাঝি হয়ে রে।
হরিনাম কালাপাতি নিতি নিতি কর দেখি এই ভাঙ্গা নেয়ে ॥
জলুই এর ঘর আঁটবে সকল, নায়েতে আর উঠবে না জল,
চল্ আমার মন বেয়ে চল্ হেলে হুঁসার হয়ে রে ;
ত্রিবেণীর তুফান ভারী, বাওনা তরী ঠাণ্ডা হয়ে গড় কাটায়ে ॥
একে তোমার ক্ষুদ্র তরী, কাজ কি তাতে ছ জন দাঁড়ি,
তায় তারা প্রবল ভারী, থাকে না বশ হয়ে ;
বিবেক দাঁড়ী বহাল করি, দেহতরি দাও ভাসায়ে ॥
ভোলানাথ বলে, যা'স না ভুলে, সদা থাকিস চরণ ধ'রে,
দেখলে পরে আসবে নারে শমন যাবে পলাইয়ে ॥

(৩)

ভেবে ভেবে কেন মর, কেন ঢাল ভস্মে ঘি,
জল না খেলে জল দেখিলে পিপাসা তায় যাবে কি ?

(অসম্পূর্ণ)

(৪)

কি কুযাত্রায় যাত্রা ক'রে এলাম মা তোর যাত্রাশালে।
না জুড়ি না রাজা মন্ত্রী আমায় চিরদিন বাঁদর সাজালে ॥
এই দুঃখ রইল চিতে, পেলাম না সাজ অঙ্গে দিতে,
মাগো ভার দিলে সিদে বহিতে, সে ফল আমার কর্ম্মফলে ॥

(অসম্পূর্ণ)

তত্ত্বকথা *

রায়সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

শাস্ত্রে কহে—ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্
অদ্বয় তত্ত্বের এই তিন অভিধান।
পণ্ডিতেরা তর্ক করি' উচ্চ নীচ ভেদ
করে তাতে ; বুঝি না তা' ; নাই কোনো খেদ।
স্থূলবুদ্ধি আমি তত্ত্বে নাহিক প্রবেশ,
আমি যাহা বুঝি, ভাবি তা'ই মোর বেশ।

শব্দব্রহ্ম মোর ব্রহ্ম, মন্ত্ররূপে যাঁরে
পাইয়াছি ভাগ্যবলে সেবা করিবারে।
অপূর্ব্ব মহিমা তার ; সাধুমুখে শুনি—
এ নহে সামান্য নিধি, এ যে চিন্তামণি।
প্রজ্ঞার বিমল জ্যোতি ভিতরে বাহিরে
স্ফুরে তার নিষ্ঠাভরে সতত যে স্মরে।
হতভাগ্য আমি তাই চিনেও না চিনি,—
কুক্কুটের কাছে তুচ্ছ পদ্মরাগমণি।

পরমাত্মা মোর আত্মা মায়ায় আবৃত,
তাই মোর দৃষ্টি হতে চির তিরোহিত।

---

* তত্ত্বে যাহার অধিকার কম, তাহার তত্ত্বালাপ প্রলাপ তুল্যই। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মন্ত্রতনু পরমাত্মা—সাধুগণ বলে—
পরম প্রকাশ তাঁর মন্ত্রের হিল্লোলে ;
মন্ত্র ধর পরমাত্মা হইবে প্রকাশ,
একই তত্ত্বের দুই বিচিত্র বিলাস।
শুনি কথা, মনে মানি, নাহিক সংশয় ;
দুঃখ এই—কর্ম্মে তবু রতি নাহি হয়।

ভগবান্ গুরু মোর করুণা নিধান
ব্রত যাঁর অশরণ পতিতের ত্রাণ।
বিভূতি বলিয়া দিত—সাক্ষাৎ ঈশ্বর
নরদেহ, কিন্তু জেনো এ ত নয় নর।
চিনে নেও, ওরে মূঢ়, গুরুরূপে কারে
পেয়েছ পরম ভাগ্যে ভবে ত্রাণ তরে।
বুঝে নেও পরমাত্মা কল্যাণ-নিলয়
বিশুদ্ধ প্রকাশ গুরু ছাড়া অন্য নয়।
এই সার তত্ত্বকথা, ক্রিয়াযোগে এরে
করে লও চিরায়ত্ত অন্য চিন্তা ছেড়ে।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড)—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত

প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—১ (অনুপলভ্য)

দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা—১—১।০ আনা

তৃতীয় ভাগ—লীলা-কথা

পূর্বার্দ্ধ—১—১।০ আনা

২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত—৫৲ টাকা

৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—।৶০ আনা

৪। বিশুদ্ধবাণী— শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত

প্রথম ভাগ—২৲ টাকা

দ্বিতীয় ভাগ—২৲ টাকা

তৃতীয় ভাগ—২৲ টাকা

চতুর্থ ভাগ—২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

কার্য্যকারক—

"বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম"

মালদহিয়া, বেনারস।